প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৯
আযাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২ /৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা ৬

অক্ষরবিন্যাস : মা দুর্গা লেজার
৩৭ জি. সি. ঘোষ রোড। কলিকাতা ৪৮

সীমিত হয়ে পড়ে ; তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে অস্বীকৃত হয়। বিশেষত আমাদের দেশে আধুনিক সাহিত্য, উনিশ শতকে যার সূচনা, তা একান্তভাবেই ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শের অনুসারী [আদৌ একে 'আধুনিক' সাহিত্য বলা যায় কিনা, ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ কতটা ঔপনিবেশিকতার ফল এসব নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে]। সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শের প্রভাবও কিছু আছে। এ অবস্থায় আধুনিক সাহিত্যবিচারে ইউরোপীয় ও সংস্কৃত সাহিত্যসমালোচনার নির্দিষ্ট পরিভাষা ও তার সুনির্দিষ্ট মানের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। ইংরেজি ভাষায় ডিকশনারি অফ ওয়ার্ল্ড লিটারারি টার্মস বা এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লিটারেচার প্রভৃতি গ্রন্থ তার প্রমাণ। এই গ্রন্থগুলি, লেখক পাঠক-সমালোচককে নানাভাবে সাহায্য করে। সাহিত্য সম্বন্ধে একটা বোধ, একটা ধারণা জন্মাতে সহায়তা করে।

বাংলা ভাষায় সাহিত্যবিচার কালে ইংরেজি-সংস্কৃত নানা পরিভাষা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। বাংলা পরিভাষাও কিছু আছে। তবে ইংরেজি পরিভাষাই সংখ্যায় বেশি। এর জন্য হীনমন্যতাবোধের কারণ নেই। সাহিত্যে যদি আমরা পশ্চিমা আদর্শ গ্রহণ করতে পেরে থাকি, তবে সমালোচনার ক্ষেত্রে তাকে অস্বীকার করি কেন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, সাহিত্যের পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা যেমন এখনও মতৈক্যে পৌঁছুতে পারিনি, তেমনি সাহিত্যের রূপ-রীতি সম্বন্ধে কোনো সর্বমান্য সংজ্ঞা রচনাও সম্ভব হয়নি। আসলে নিত্য নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাহিত্যের রূপান্তর অনস্বীকার্য, ফলে উনিশ শতকে, এমনকি বিশ শতকের প্রথমার্ধেও, আমরা যে সব সাহিত্যকৃতি সামনে রেখে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপরীতির পরিচয় গ্রহণ করেছি, বিশ শতকের সমাপ্তিকালে যে সব ধারণার পুনর্বিচার প্রয়োজন হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, উপন্যাস ও ছোটগল্পের শিল্পরূপ এত বেশি পরিবর্তিত হয়েছে যে, উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংজ্ঞাও অপরিবর্তিত থাকেনি। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির পাশে ঢোঁড়াই চরিত মানস, মহিষকুড়ার উপকথা, তিস্তাপারের বৃত্তান্তকে রাখলে উপন্যাসের সংজ্ঞা-স্বরূপ নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হয়। আইভ্যান হো-র পাশে স্পার্টাকাস, কিংবা দুর্গেশনন্দিনীর পাশে রাজনগরকে রাখলে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয়। এইভাবে সাহিত্যের শব্দার্থকোষও নতুন করে রচনা করতে হয়—কালান্তরের ইঙ্গিত মেনে।

সম্প্রতিকালে বাংলায় সাহিত্যপ্রকরণ তথা সাহিত্যের রূপরীতি নিয়ে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নতুন বইয়ের প্রয়োজন মনে হয় এখনও ফুরোয়নি। সাহিত্যের ছাত্রকে যেমন শব্দার্থকোষ থেকে সাহিত্যের রূপরীতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আয়ত্ত করতে হবে, তেমনি রূপরীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে আমার সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীশুভঙ্কর ঘোষ নিজে সাহিত্যসৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত। সেই সঙ্গে স্বদেশি ও বিদেশি সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। দীর্ঘদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফলে সাহিত্যের রূপভেদ সম্বন্ধে তাঁর মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। সেই ধারণা থেকে তিনি লিখেছেন সাহিত্যের রূপভেদ নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি বই। আপাতত তিনি উপন্যাস. ছোটগল্প এবং প্রবন্ধসাহিত্যের নানা ধারা-উপধারা নিয়ে স্বল্পপরিসরে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে তাঁর

স্বকীয়তার পরিচয় পাঠকেরা পাবেন। হয়তো তাঁর কোনো কোনো মত বিতর্ক সৃষ্টি করবে, তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্ত কারও মনঃপূত হবে না। কিন্তু প্রথাগত আলোচনার থেকে এই ধরনের ব্যতিক্রমী আলোচনা অনেক বেশি মূল্যবান। সাহিত্যের রূপভেদ নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে, পাঠক বিষয়টি নিয়ে ভাববেন, হয়তো কখনও প্রতিবাদ করবেন—সেখানেই সাহিত্য সমালোচনার সার্থকতা। আমি অধ্যাপক শ্রীশুভঙ্কর ঘোষের সাহিত্যের রূপভেদ বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। আশাকরি বইটি পাঠকদের কাছে যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করবে, এবং তখন তিনি কাব্য, নাটক, শিল্পতত্ত্বের রূপভেদ নিয়ে পরিপূরক আর একটি গ্রন্থ রচনা করবেন।

উপন্যাস সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য

কাব্য বা নাটকের থেকে বয়সে ছোট হলেও শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাস দ্রুত পরিণতি লাভ করেছে। উপন্যাসের বীজ মধ্যযুগে সন্ধান করেছেন কেউ কেউ কিন্তু একদিক থেকে এটি সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামোয় উপন্যাসের জন্মলাভ সম্ভব ছিল না। 'ফিউদাল সমাজ বা রাজতন্ত্রী অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সাহিত্য জন্মলাভ করেনি। ফিউদাল সমাজের পরিবর্তে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানই উপন্যাসের জন্ম সম্ভব করেছে। মুদ্রাযন্ত্র এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। মুদ্রাযন্ত্রের মধ্য দিয়ে পত্র, পত্রিকা, পুস্তিকা, বই প্রকাশের ফলে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকসমাজের সীমা ক্রমবর্ধিত হতে থাকে। তখন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের অনুগ্রহের উপর আর কেউ নির্ভরশীল থাকে না। সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্র নয়, বুর্জোয়াতন্ত্রই ক্রমশ সমাজে নেতৃস্থান অধিকার করে নিয়েছে। শহরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা তারই প্রমাণ। এই মধ্যবিত্ত সমাজই উপন্যাসের লেখক ও পাঠক। কাজেই উপন্যাসকে ব্যালাড, এপিক, নভেলা বা 'তথাকথিত' রোমান্‌সের কালানুক্রমিক পরিণতি বলা সঙ্গত নয়। বরং উপন্যাস নতুন সৃষ্টি, নতুন সমাজ মানসের সৃষ্টি।' [দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা]।

আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার জাগরণ, বাস্তবতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ উপন্যাসের উদ্ভবের মূলে রয়েছে। সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখা দিলেই ব্যক্তি বা individual-এর বিকাশ ঘটে। সমাজবিকাশের ধারায় লক্ষ্য করি ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের প্রসার, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তশ্রেণীর দাবি উপন্যাস সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত অধিকাংশ বই ধর্মবিষয়ক হলেও মধ্যবিত্তশ্রেণীর চাহিদাই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১) ও হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-১৭৫৪)-এর উপন্যাসে মধ্যযুগীয় রোমান্স-এর পরিবর্তে সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া গেল। রিচার্ডসনের পত্রোপন্যাস 'পামেলা' (১৭৪০)। পামেলা পরিচারিকা হয়েও তার মনিবের পত্নী হবার সুযোগ পেল—এ ঘটনা সাধারণ নিয়ম ছিল না, তবু প্রচলিত প্যাটার্নকে ভেঙে দিয়ে, পারিবারিক বাস্তবের ঐতিহ্যকে বদলে দিতে প্রেম ও বিবাহ জয়যুক্ত হল। রিচার্ডসনের পামেলার তুলনায় 'ক্লারিসা'য় বাস্তবানুগত্য অনেক বেশি। ক্লারিসার জীবনের ট্র্যাজেডি সমাজবাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। আসলে পামেলায় রিচার্ডসন রোমান্টিক, ক্লারিসায় রিয়ালিস্ট। তথাপি ফিল্ডিংই বাস্তবধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাতা। এক্ষেত্রে সমালোচকের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, 'ডেফোর উপন্যাসের সমাজসচেতনতা, যুগধর্ম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থনৈতিক তাৎপর্য সক্রিয় হলেও উপন্যাসের সামগ্রিক শিল্পরূপ তাদের মধ্যে নেই। রিচার্ডসন পত্রোপন্যাসের অবয়বে হৃদয়জগতের কথা, রোমান্টিকতা আনলেও, উপন্যাসের শিল্পরূপের দিক থেকে তিনি শিথিলবদ্ধ। একটি বিশ্বাস্য কাহিনী, পরিচিত নরনারী, সমাজের বাস্তবসমস্যা এবং মানুষের হৃদয়-বেদনা যখন একটি সুগঠন লাভ করে তখনই আমরা বলি উপন্যাস। ফিলডিং-এর হাতে এই শিল্পরূপের প্রতিষ্ঠা।' [উপন্যাসের কথা]। ফিল্ডিং-এর 'জোসেফ অ্যানড্রুস', 'জোনাথন ওয়াইল্ড', 'টম জোনস' আর 'অ্যামেলিয়া'—এই চারটি উপন্যাসের সূত্রে রিয়ালিজমের যে পথ সুগম হল, সে পথেই স্মলেট, ডিকেন্‌স, থ্যাকারে—আরো পরবর্তী কালে অনেকেই এই শিল্পরূপটি আধুনিকতার

মাত্রায় সমৃদ্ধ করলেন। অন্য প্রকার ব্যাখ্যায় জানা যাচ্ছে, 'সময়ের সীমা মানলে চরিত্রবিকাশও স্পষ্ট রূপ নেবে, শিল্পের প্রয়োজনীয় ভ্রান্তি বা ইল্যুসন সার্থক হবে। তাই ডিফোকে ছেড়ে ধীরে ধীরে রিচার্ডসন ফিলডিং-এর মধ্য দিয়ে উপন্যাস তার চরিত্রবিকাশকে মেনেছে, জীবনসংগ্রাম মেনেছে, সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি সেই সংগ্রাম ও বিকাশকে স্পষ্টতর করেছে—যদিও সম্পূর্ণ রূপ পেতে আরো সময় লেগেছে। যে মধ্যবিত্ত মানুষ সমস্যায় পড়ে সে সমস্যাকে বোঝে, চরিত্রের সংকটকে দেখতে চায়। মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের আবরণ-ভঙ্গ ঘটিয়ে সেই সংকটের তীব্রতর স্বাদ পেয়ে বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের ব্যাপকতর গভীরতর স্বাদ পেতে চায়। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের এই সাধারণ লক্ষণগুলিই ফুটে উঠেছে। পরে মনোবিজ্ঞান এই লক্ষণপ্রকাশে সহায়তাও করেছে যথেষ্ট।' [উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : সাহিত্যের রূপরীতি]।

উপন্যাসের পরিচয় নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ হয় না। মপাসাঁ যে তাঁর প্রবন্ধে কুড়িখানা উপন্যাসের তালিকা তৈরি করেছিলেন, তাতে সবগুলিকে একই সংজ্ঞার নিরিখে উপন্যাস বলা যাবে না। উপন্যাস ছোটগল্প নয়, কবিতা নয়, নাটক নয়। কবিতা বা নাটকের তুলনায় উপন্যাসে স্বাধীনতার অবকাশ অনেক বেশি হলেও সমস্যাও বেশি। 'সার্থক শিল্পী জানেন যে মানুষের অন্তর্মুখীনতা বা হৃন্ময়তা কবিতারই বিষয়, তার দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্ব নাটকেরই বিষয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও জানেন যে সেই হৃন্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি যখন সামাজিক মানুষের সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত করে দেখাতে চান তখনই উপন্যাসের অগ্রাধিকার।' [বাংলা উপন্যাসে কালান্তর/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়]। এই সমালোচক একই সঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'উপন্যাসের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। দ্বন্দ্বময় চরিত্রসৃজনে সফল হলেই ভালো নাটক সৃজিত হয়। অনুভূতিকে চিত্রকল্পময় করতে পারলেই কবিতার সাফল্য আসে। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করতে না পারলে উপন্যাস ব্যর্থ। জীবনের গোটা রূপই উপন্যাসকারের ধ্যেয়।' এও মনে রাখতে হবে, 'একটি উপন্যাস থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত শুধু জীবন খুঁজি না, জীবন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের কী বক্তব্য সেইটারই সন্ধান করি।' পাশাপাশি, উপন্যাসে একজন ঔপন্যাসিকের attitude towards life এবং totality of life-এর সন্ধানও জরুরি বিবেচিত হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট জীবনদর্শনই উপন্যাসকে গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। সর্বোপরি, উপন্যাসে একটি বক্তব্য থাকবেই, 'বক্তব্যহীন উপন্যাস' কখনো হয় না।

উপন্যাস বা নভেল মূলত গদ্য আখ্যান। 'As an extended narrative, the novel is distinguished from the short story and from the work of middle length called the 'novelette'; its magnitude permits a greater variety of characters, greater complication of plot (or plots), an ampler development of milieu, and a more sustained and subtle exploration of character than do shorter, hence necessarily more concentrated, modes.' [*A Glossary of Literary Terms*]। ইউরোপীয় ভাষায় 'novel' বলতে বোঝাত 'রোমান' [Roman] ; যা কিনা মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে 'রোমান্স' [Romance] বলে পরিচিত ছিল। তবে 'novel' শব্দটি ইতালীয় 'novella' (tale, piece of news') থেকে এসেছে। কিন্তু 'now applied to a wide variety of writings whose only

common attribute is that they are extended pieces of prose fiction. [*Dictionary of Literary Terms*], তবে extended শব্দে অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে দেয়। এখন অবশ্য একটি উপন্যাস ষাট-সত্তর হাজার থেকে প্রায় দুই লক্ষ শব্দ-সীমায় গড়ে ওঠে। একথাও মানতে হবে যেভাবে আমরা উপন্যাসের সংজ্ঞাবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করছি, শতকে শতকে ও বর্তমান কালে তার নানা সংজ্ঞায় ও বৈশিষ্ট্যে অভিনবত্বও লক্ষ্য করছি। নভেল্লা থেকে নভেলের উৎসের কথা উল্লেখ করলেও অনেকে নভেলের পূর্বসূরি হিসেবে ষোড়শ শতকের স্পেনে উদ্ভূত Picaresque narrative বা পিকারেস্ক আখ্যান বা পিকারেস্ক নভেলের কথাও বলে থাকেন। এর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'Picaresque fiction is realistic in manner, episodic in structure and usually satiric in aim.' স্পেনে উদ্ভূত হলেও সমগ্র ইউরোপেই এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু novel যখন তার উৎস থেকে উজান, উজান বেয়ে মোহানায় পৌঁছুচ্ছে, তখন তাকে সম্পূর্ণ নতুন শিল্পরূপ হিসেবে বিবেচনা করাই সঙ্গত।

সামন্ততান্ত্রিক বা অভিজাততন্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে উপন্যাস বুর্জোয়া সমাজের মধ্য থেকে যখন নির্দিষ্ট আকৃতি পেতে থাকে, তখন তার মূল কথাই হল বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে উপন্যাস রচিত হতে পারে না। সমকালীন বাস্তবই নয়, যদি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেও উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়, তবে সেখানে কল্পনার বাস্তব ও ইতিহাসের বাস্তবকে মেশাতে লেখকের প্রাণপণ চেষ্টা থাকে। তবে রোমান্সের বর্ণময়তায় ঋদ্ধ হয়েও অনেকসময় বিগতকালের বাস্তব, ঘটে যাওয়া ঘটনাপঞ্জীর সূত্রেও উপন্যাস গড়ে ওঠে। হয়তো সেখানে রোমান্সরস দুর্লভ নয়, কিন্তু লেখকের কল্পনাশক্তি, দেশকাললগ্ন অতীত সত্য, বর্তমানের সমাজবাস্তবের আবহে উপন্যাসকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দিতে পারে। ওয়ালটার স্কট কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স লিখেছেন, উপন্যাস লিখলেও রোমান্সের স্বাদ সঞ্চার করেছেন। রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। সেখানে মিশ্র বাস্তব ও অবিমিশ্র বাস্তবের কারবার লক্ষ্য করি। তাতে উপন্যাস ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

একথা সত্য, 'উপন্যাসই বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত মিলনপদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সমস্তরকম বৈচিত্র্যের সুযোগ আছে।' ঔপন্যাসিকের জগৎ অবশ্যই অভিজ্ঞতার জগৎ। কিন্তু অভিজ্ঞতার ডক্যুমেন্টেশনই শিল্প নয়। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতাকে শিল্পঅভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করাই বড় কাজ। একটা উপন্যাসে জীবন এভাবেই শিল্পিত হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের পক্ষে জরুরি গুণ হল, 'বস্তুজগতের আহরিত তথ্যকে সামঞ্জস্যসূত্রে গেঁথে তোলার ক্ষমতা। সেই সামঞ্জস্যসূত্রটিকে আবিষ্কারের পিছনে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত 'ভিশন' কাজ করে।' শুধু তাই নয়, 'ঔপন্যাসিক তাঁর অসীম মানসিক ক্ষমতার বলে সমগ্র জীবন ও তার পটপরিদৃশ্যকে আশ্চর্য দক্ষতায় জীবনীয় করে তোলেন বলেই তা শিল্পকর্ম। উপন্যাসের গঠনকর্ম সেই ব্যক্তিগত ভিশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঔপন্যাসিকের গভীরস্পর্শী দৃষ্টি, মাত্রাজ্ঞান, ঝোঁক, মানবিক উপাদানের উপস্থাপনা—সমস্ত কিছুই উপন্যাসের গঠনকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে।' হেনরি জেমসের কাল থেকে আজ পর্যন্ত উপন্যাসের রচনাপদ্ধতির বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকাশপদ্ধতি, রচনাপদ্ধতি ও শিল্পকৌশল উপন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপন্যাসিকের শিল্পকৌশলের মূলে থাকে তাঁর নির্বাচনী ক্ষমতা। 'উপন্যাসের চরিত্র, মিলিউ, প্লট এবং ঘটনাংশ সমস্ত কিছুতেই লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে। যেহেতু

আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতার সমস্ত কিছুই পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ এবং সংযুক্ত, সেই হেতু লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ভিতরেই সেই শক্তি রয়েছে যা ঘটনা, চরিত্র এবং খুঁটিনাটি বিষয় ও বিষয়াংশের নির্বাচনে জীবনের গোটারূপকে আভাসিত করে তোলে।' [বাংলা উপন্যাসের কালান্তর]।

ইংল্যান্ডে যেমন আর্থসামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আঠারো শতকে সুইফট, ডিফো প্রভৃতির উপন্যাস প্রকাশিত হল, রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং উপন্যাস লিখলেন, পরবর্তীতে স্মলেট, ডিকেনস, থ্যাকারে, তেমনি ফরাসি কথাসাহিত্যে, রক্তক্ষয়ী ফরাসি বিপ্লবের পর স্তাঁদাল, বালজাক ও হুগো—এঁদের হাতেই উপন্যাস পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। স্তাঁদালের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা বা Psychological realism, বালজাকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বা Socio-economic realism উপন্যাসকে ভিন্ন মাত্রা দিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাস্তবধর্মিতার নবরূপ ফরাসি কথাসাহিত্যের বিশিষ্টতা। পূর্ববর্তী ফ্লবেয়ার, পরে গঁকুর, এমিল জোলার উপন্যাসে প্রকৃতিবাদ বা Naturalism পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। কিন্তু আঠারো শতক অবধি রুশ সাহিত্যে মুদ্রাযন্ত্র বা গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। উনিশ শতকে একদিকে জার ও অভিজাততন্ত্র, অন্যদিকে কোটি কোটি ভূমিদাস—এমন সমাজকাঠামোর মধ্য দিয়ে উঠে এলেন পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭), গোগল (১৮০৯-১৮৫২), তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩), দস্তয়েভসকি (১৮২১-১৮৮১), তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)। বাংলা উপন্যাস গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপ্রসারের সংযোগ উপন্যাস রচনাকে ত্বরান্বিত করেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে বলা হয়েছে 'সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের যুগ, Romantic Imagination-এর যুগ।' ইতোপূর্বে বাবুকালচারের মহাভারত 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ উপন্যাসের সম্ভাবনা অনুভূত হয়েছে। এখন মধ্যযুগীয় রূপকথা, রোমান্স, স্বপ্নের কল্পরাজ্য অতিক্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), যাঁর সাহিত্যিক জীবন ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত বিস্তৃত, লিখেছেন চোদ্দখানি উপন্যাস। তার মধ্যে রয়েছে আধুনিক কাব্যধর্মী রোমান্স, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বঙ্কিমের উপন্যাসে রোমান্সের আধুনিক রূপ, বাস্তবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নারী চরিত্র দৃষ্টিগোচর হল। সেইকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতি এবং তারও পরে পঞ্চাশের দশকের মহাশ্বেতা দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত লেখকদের উপন্যাসে বহুমাত্রিক জীবনের বাস্তব ও সমাজ পরিপ্রেক্ষিত, নরনারীর ব্যক্তিক মনের আলো-আঁধারি, আত্মিক বা নৈতিক সংকট, বিচ্ছিন্নতা, এককের যন্ত্রণা বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উপন্যাসের গঠনরীতি (উপাদান ও উপকরণ)

উপন্যাস গড়ে তুলতে হলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান বা উপকরণের প্রয়োজন। এগুলি হল, আখ্যানভাগ [Plot], চরিত্র [Character], সংলাপ [Dialogue], পটভূমি ও প্রতিবেশ [Setting and Milieu] এবং শৈলী [Style]। সাধারণত উপন্যাসে কাহিনীবস্তুর অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। পাঠক চান গল্প, যাকে Story বলতে পারি ; কিন্তু গল্প নানাভাবে উপস্থাপিত হতে পারে, তার বিন্যাসে থাকতে পারে শিথিলতা, এলায়িত ভঙ্গি। প্লট তা নয়। প্লটে গল্পের একটি পারম্পর্য থাকবে। তা জীবন থেকে ছেঁকে নেন লেখক। আখ্যানভাগ অগ্রসর হবে চরিত্রের সাহায্যে, চরিত্রের ডায়ালগের সাহায্যে। খুব স্বাভাবিক কারণেই আমরা স্থানকালপাত্রের কথা যে বলে থাকি, সেক্ষেত্রে প্রতিবেশ-পটভূমিকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ থাকে না। উপন্যাসে বা গল্পে আমরা যা বলি তা বক্তব্য, যেমনভাবে বলি তা শৈলী বা Style—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : 'আত্মাহীন দেহ যদিবা সম্ভব, বক্তব্যহীন উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়।' [বাংলা উপন্যাসের কালান্তর]। বক্তব্য উপস্থাপনরীতিকে স্টাইল বলি। অর্থাৎ উপন্যাসের উপাদান-উপকরণে প্লট, চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি-প্রতিবেশ এবং শৈলী জরুরি বলে বিবেচিত।

প্লট [Plot]—প্লট একধরনের শিল্পকৌশল। গল্প যখন কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়, তখন তাকে প্লট বলি। আরিস্টটল প্লটকে অ্যাকশনের অনুসারী বলেছেন। এলিজাবেথ বাওয়েনের বক্তব্য, 'প্লট উপন্যাসের গল্পকে তার গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে, গন্তব্যপথের সন্ধান দেয়।' জোসেফ টি শিপলে সম্পাদিত গ্রন্থে যা ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমান সত্য, 'Plot is that framework of incidents, however simple or complex, upon which the narrative or drama is constructed ; the events of the depicted struggle, as organized into an artistic unit. In the Poetics Aristotle names plot as the first essential of drama or epic. The elements of plot are a beginning that presumes further action, a middle that presumes both previous and succeeding action and an end that requires the preceding events but no succeeding action. [*Dictionary of World Literary Terms*.] অবশ্য M. H. Abrams-এর আলোচনায় ভিন্নভাবে হলেও বক্তব্যে ভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করি, 'The order of a unified plot, Aristotle pointed out, in a continuous sequence of beginning, middle, and end. The beginning initiates the action in a way which looks forward to something more ; the middle presumes what has gone before and requires something to follow ; and the end follows from what has gone before but requires nothing further ; we are satisfied that the plot is complete.'

প্লট ও স্টোরি শব্দ দুটির সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করেছেন ই. এম. ফর্স্টার, তাঁর *Aspects of Novel* গ্রন্থে। অন্যান্য সমালোচক থেকে এইখানে তিনি স্বতন্ত্র। গল্পের পাঠক জানতে চান, 'তারপর কি হল?' কথমেতৎ? and then ? তারপর? উপন্যাস-পাঠক জানতে চান,

'কেন এমন হল?' ফর্স্টার বুঝিয়েছেন, 'The king died, and then the queen died' অর্থাৎ 'রাজা মারা গেলেন, তারপর রাণী মারা গেলেন'—একে বলা যাবে গল্প। কিন্তু 'The king died, and then the queen died in grief' অর্থাৎ 'রাজা মারা গেলেন, তারপর সেই দুঃখে রাণীর মৃত্যু হল'—এরই নাম প্লট। অর্থাৎ প্লটে কালপারম্পর্য বিদ্যমান বটে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে প্রাধান্য পেয়েছে কার্যকারণবোধ। আর যদি বলা যায়, 'রাণী মারা গেলেন, কেউ জানত না তাঁর মৃত্যুর কারণ ; অবশেষে জানা গেল যে রাজার মৃত্যুক্ষোভই তাঁর মৃত্যুর কারণ'—তাহলে প্লটের মধ্যে এল রহস্যের ছায়া। [সূত্র : শ্যামাপ্রসাদ সরদার, 'প্লট', অলোক রায় সম্পাদিত : সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য]। এভাবে কাহিনী গড়ায়। 'গল্পের দাবি কালানুক্রমে সাজানো ঘটনাস্রোতের প্রতি শ্রোতার কৌতূহলটুকু, কিন্তু প্লটের দাবি শ্রোতার বুদ্ধির কাছে এবং ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণগত যোগটি মনে রাখার সামর্থ্যের উপর।'

প্লটকে নানাভাবে ভাগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১. সরল [Simple], জটিল [Complex] ও যৌগিক [Compound] প্লট। ২. শিথিল গঠন [Loose] প্লট ও দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন [Organic] প্লট। ৩. উপস্থাপন পদ্ধতি সূত্রে, প্যানোরামিক [Panoramic] প্লট ও সীনিক [Scenic] প্লট। কখনো বা ক্ল্যাসিকাল [Classical] প্লটের উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি, বিন্যাসপদ্ধতির দিক থেকে বলা হয়েছে বৃত্তাকার, পদ্মাকার ও হর্ম্যাকার প্লটের কথা। এই যে বিভাজন ও অভিধাপ্রয়োগ এদের বৈশিষ্ট্যে, তার সাধারণ স্বরূপ লক্ষ্য করা দুষ্কর নয়।

সরল প্লট, ফর্স্টারের ভাষায়, story। জটিল প্লট হল 'প্লট'। সরল প্লটের উপন্যাসে একটি কাহিনী থাকছে। উপন্যাস রচয়িতা এই একটি কাহিনীর সাহায্যে উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু জটিল প্লটের উপন্যাসে, এক নয়, একাধিক কাহিনীর উপস্থাপনা ও অগ্রগতি। যৌগিক প্লটের ক্ষেত্রেও উপন্যাসে একাধিক কাহিনী থাকবে, সেক্ষেত্রে একাধিক কাহিনীকেই মূল কাহিনী মনে হতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনায়, এখানে একাধিক কাহিনী থাকলেও, একটি প্রধান কাহিনী থাকবে, বাকি কাহিনীকে গৌণ বা উপকাহিনী বলা যেতে পারে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীকেন্দ্রিক একটিমাত্র কাহিনী। সেখানে অন্য কোনো কাহিনীর প্রয়োজন হয়নি। অপর দিকে 'কপালকুণ্ডলা'কে ক্ল্যাসিকাল প্লটের দৃষ্টান্ত ধরা হয়ে থাকে। 'একটি কাহিনীকে জটিলতায় নাটকীয় করে তারপর তাকে গ্রন্থি-মুক্ত করা'-এখানে লক্ষ্য। কপালকুণ্ডলা-নবকুমার সাক্ষাৎ, কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারের পরিত্রাণ, উভয়ের বিবাহ, অধিকারীর ভূমিকা, সংসার-অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলার সপ্তগ্রাম যাত্রার মধ্য দিয়ে কাহিনীর প্রতিষ্ঠা বা establishment। মতিবিবি-নবকুমার এপিসোডে অ্যাকশনের বিস্তার। ক্রাইসিস জমে ওঠে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের বিচ্ছেদ ঘটানোয় মতিবিবির প্রচেষ্টা, কাপালিকের সহযোগ, ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবিকে কপালকুণ্ডলার উপপতি ভাবনায় নবকুমারের সন্দিগ্ধতাবৃদ্ধি, তদুপরি কাপালিকের উক্তিতে সংকট ঘনীভূত হয়েছে। সংকটের গ্রন্থিমোচন, নবকুমারের স্ত্রীকে হত্যার সঙ্কল্প, অথচ কপালকুণ্ডলার কথায় সন্দেহমুক্ত হওয়া। কপালকুণ্ডলার সংসারবৈরাগ্য ও জলস্রোতে ভেসে যাওয়া, যার অনুগামী হলেন নবকুমারও। একাধিক কাহিনী, বা, অন্তত দুটি কাহিনী পাওয়া যাবে 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যে দ্বৈতপ্লট পাওয়া যায়। এই ধারাতেই ইংরাজি

উপন্যাসেও। দ্বৈতপ্লটের সেরা দৃষ্টান্ত টলস্টয়ের War and Peace। একদিকে পীয়ের, নাটাশা, আন্দ্রেই ও অন্যান্য স্বজন। অন্যদিকে জার, নেপোলিয়ন, কুটুজভ ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। একদিকে ব্যক্তিজীবন অন্যদিকে ঐতিহাসিক জাতি সংঘর্ষের ছবি। 'আসলে, সংযম ও লক্ষ্যের প্রতি একমুখীনতা থাকলেই এই একাধিক প্লটের কাহিনীকে সার্থকভাবে ঐক্যে আনা যায়।'

প্যানোরামিক প্লটের গঠনকৌশল সংহত নয়, শিথিলবিন্যস্ত। সীনিক প্লটের অনিবার্যতা, যুক্তিগ্রাহ্যতা ও নাটকীয়তা প্যানোরামিক প্লটে নেই। প্যানোরামিক প্লটে 'চরিত্রের সংখ্যা বহু, তাদের মধ্যে অধিকাংশ চরিত্রই ব্যক্তিস্বভাববর্জিত টাইপধর্মী, ঘটনানিয়ন্ত্রণে কোন একটি বিশিষ্ট চরিত্রের ভূমিকা নগণ্য। অন্যদিকে সীনিক প্লটে একটিমাত্র সূত্রের দিকে উপন্যাসের বিন্যাস কেন্দ্রীভূত।…ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক সীনিক প্লটে দৃঢ়পিনদ্ধ ভাবে বিদ্যমান থাকে।…প্যানোরামিক প্লটে যেহেতু জীবনের বহু বিস্তৃত দিক আমন্ত্রিত তাই তার পটভূমি অনুরূপ বিস্তৃত। সীনিক প্লটে পটভূমি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত। মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের প্লটের গঠনশৈলী প্যানোরামিক এবং নাটকীয় উপন্যাসের প্লটের গঠনশৈলী সীনিক।'

উপন্যাসের বিন্যাসপদ্ধতি বা গঠনরূপের দিক থেকে প্লটকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. দৃঢ়সংবদ্ধ প্লট—বৃত্তাকার—যেমন, কপালকুণ্ডলা ; ২. শিথিলগঠন প্লট—পন্থাকার—যেমন, পথের পাঁচালী ; ৩. জীবনের বহুবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে নির্মিত জটিল প্রকৃতির গঠনরূপ বা গঠনশৈলীর প্লট—হর্ম্যাকার—যেমন, রাজসিংহ। আদিমধ্যঅন্তসমন্বিত হয়ে কাহিনীর সমস্যা একটি অনিবার্য ও যুক্তিপরম্পরাঋদ্ধ হয়ে তীব্র বেগে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হলে প্লট বৃত্তাকার হয়ে ওঠে। স্থান-কাল-ঘটনার মধ্যেও সেক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের অভাব থাকবে না। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কাহিনী আদিমধ্যঅন্ত পরিণামী—সুসংহতিও প্রত্যাশিত মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু পথের পাঁচালী 'বৃত্তাকার' নয়, পন্থাকার এইজন্য সেখানে প্লট দৃঢ়সংবদ্ধ নয়, শিথিলগঠন। অপুর জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা, ছবি, কিছু চরিত্রের সহযোগে তা সম্পূর্ণ। সেখানে এলায়িত গঠনই প্রাধান্য পায়। কিন্তু জটিল প্রকৃতির হর্ম্যাকার প্লটে, রাজসিংহ উপন্যাসে, বিস্তৃত পটভূমিকা, মূল কাহিনী রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী-ঔরঙ্গজেব, উপকাহিনী মবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসা, নির্মলকুমারী-মানিকলাল ইত্যাদি অসংখ্যচরিত্র, দৃশ্য, ঘটনা, পরিস্থিতির সমাবেশ।

মনে রাখতে হবে প্লট আর থীম এক ব্যাপার নয়। প্লটের ধারণা ও ব্যবহার উপন্যাসে ধীরে ধীরে এসেছে। 'ডন কুইকজোট' বিশুদ্ধ Story, ডিফো ও স্মলেট এরই অনুগামী। রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং-এর লেখাতেই প্লট রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। বিংশশতকে অনেকেই প্লটের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার তিরিশ বছরের কালসীমায় প্লটের আধিপত্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে গতশতকের নব্বই দশক থেকে প্লট ও থীম-এর দ্বন্দ্ব দেখা গেল। সমালোচক বলবেন, প্লটের গল্প ও একটি 'রচনার' পার্থক্য আছে। 'যাকে রচনা বলছি তার অবলম্বন প্লট নয়, বক্তব্য, ইংরেজিতে যাকে বলে থীম।' প্লট একবারই জন্মায়, বলা উচিত তাকে বানিয়ে তোলা হয়। তার মৃত্যুও চিরকালের। বুদ্ধদেব বসু ব্যাখ্যা করেছেন : 'প্লটনির্ভর গল্প বাসাবদল করতে পারে মগজের কারখানাঘর থেকে মনের মিনারে, রোমাঞ্চ থেকে রোমান্সে, রোমান্স থেকে বাস্তবতায় ; কিন্তু উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করলেও স্বভাবের বদল হয় না তার, যেটুকু দেবার একবারেই ফুরিয়ে ফেলে সে,

দুটি গল্পের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য ধরা পড়লেই পরবর্তীর বিষয়ে পরস্বাপহরণের সন্দেহ জেগে ওঠে।' তিনি থীমকে 'রক্তবীজ-রক্তবান' বলেছেন। থীম বা বক্তব্যর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। 'গল্পের গাড়িতে প্লটকে চড়তে দিলে সে নিজেই চালক হয়ে বসবে, কিন্তু বক্তব্যকে বলা যেতে পারে বাষ্পবেগ, নিজের কোনো দাবি নেই তার ; সে প্রেরণা আনে, কিন্তু পরিচালনার ভার যেখানে থাকা উচিত সেখানেই ছেড়ে দেয়, লেখকের মনস্বিতাকেই বসিয়ে রাখে এঞ্জিন ঘরে। জলের মতো তার স্বভাব, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, চিরানুক্রমিক ; কখনো বলা যাবে না যে এই শেষ আর এই আরম্ভ, অথচ তা নিত্যই নতুন।' বুদ্ধদেব বসুর মতে, সবুজপত্র যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্লটকে বিদায় জানিয়েছেন এবং গল্পগঠনের পরীক্ষাপদ্ধতি শুরু হয়েছে।

চরিত্র—প্লট এবং চরিত্রের মধ্যে একটি ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে। অনেকের ধারণা, উপন্যাসে চরিত্র গৌণ ও ঘটনা মুখ্য। 'সাহিত্যসন্দর্শন'কার বলছেন, ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, একটি অপরটির সহিত নিগূঢ় ভাবে জড়িত। চরিত্র, প্লট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থান উল্লেখসূত্রে তিনি শরৎচন্দ্রের অভিমত জানিয়েছেন—'অন্যান্য গ্রন্থকারদের যা নিয়া বিপদ—প্লট পায় না—সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার তাহা আপনি আসিয়া পড়ে। আসল জিনিষ কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার।' দুর্গেশনন্দিনীর কাল থেকে চোখের বালি পর্যন্ত এবং তারও পরে চরিত্রের স্বরূপবৈশিষ্ট্য বদলে যাচ্ছে। আরো লক্ষণীয়, সমাজজীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক সমস্যানিষ্ঠ উপন্যাসে চরিত্রের গুরুত্ব বেড়েছে অপরিসীম।

J. A. Cuddon ব্যাখ্যা করেছেন, 'The subjects of Characterology fall into roughly three categories : (a) a type—a self-conceited man, a blunt man ; (b) a social type—an antiquary, an old college butler, (c) a place or scene : a tavern or cockpit. The idea was to create an individual while formulating a type.'

সাহিত্যসমালোচনার পরিভাষায় চরিত্রকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—এক. টাইপ বা নির্বিশেষ চরিত্র, দুই. ইনডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিচরিত্র। বর্তমানকালে ই. এম. ফর্স্টার জনপ্রিয় দুটি ভাগে চরিত্রকে ভাগ করেছেন : এক, Flat character ও দুই, Round Character. Flat character বা সমতলসদৃশ চরিত্রই টাইপ, থিন বা ডিস্ক ক্যারেকটার, ফর্স্টারের ভাষায় two dimensional character। আর Round characterকে বলা হচ্ছে বৃত্তাকার চরিত্র। ফর্স্টারের মতে 'A flat character, (also called a type, two dimensional) is built around 'a single idea or quality' and is presented in outline and without much individualizing detail, and so can be fairly adequately described in a single phrase or sentence. Round character is complex in temperament and motivation and is represented with subtle particularity, thus he is as difficult to describe with any adequacy as a person in real life, and like most people, he is capable of surprising us.' ফ্ল্যাট বা সমতলসদৃশ চরিত্র কাহিনীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একই রকম থেকে যায়। সমতলসদৃশচরিত্র বহুমাত্রিক বা বহুরৈখিক নয়, তা একমাত্রিক বা একরৈখিক। উপন্যাসে

এই ধরনের চরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত রূপান্তর লক্ষিত হয় না। ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড-এর মিসেস মিকবার, চতুরঙ্গের শ্রীবিলাস সমতলসদৃশ চরিত্র। কিন্তু যে চরিত্রের বিবর্তন তাদের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যেই আভাসিত, যে চরিত্র কাজে, কথায়, গতিবিধিতে, ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতে আগাগোড়া লেখকের সহায়তায় বিবর্তনশীল, সেই চরিত্র Round বা বর্তুলাকার। এই ধরনের চরিত্র নির্ঝঞ্জাট বা নির্দ্বন্দ্ব নয়, দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়েই তার বিকাশ। বৃত্তাকার চরিত্র একরঙা নয়। তাকে একদিক থেকে নয়, নানা দিক থেকে দেখবার সুযোগ থাকে। 'অনেকগুলি রঙে আঁকা হয় এই চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'বৃত্তিনিচয়ের অসামঞ্জস্য' একে জীবন্ত করে তোলে। কেন্দ্রস্থ শক্তি একটি হলেও, কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মেলে অনেকগুলি রেখার রশ্মিসম্পাত, এবং তারই ফলে, চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

আমরা বলতে পারি, কাহিনীকে কাঠামো ভাবলে, চরিত্র সেই কাঠামোর স্তম্ভ বিবেচিত হবে। চরিত্রকে গৌণ ভাববার কারণ নেই, কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য চরিত্র। 'কেউ কারোর থেকে কম প্রয়োজনীয় নয়। বলতে গেলে, কাহিনী ও চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও ওতপ্রোত। চরিত্রকে ঘিরে কাহিনী। আবার কাহিনীর ফলশ্রুতি চরিত্র।' [শিশির চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাসের স্বরূপ]।

উপন্যাসে চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে যে সমস্যা নেই, তা নয়, প্রশ্নও আছে। এই সমস্যা উপলব্ধি করেও ম্যালকম ব্রাডবারি মন্তব্য করেছেন : 'Character' is perhaps the most mimetic term in the critical vocabulary, and hence one of the most difficult to contain within the fictional environment ; yet it is an essential condition of fictional existence that a character is so contained. In this sense the representation of persons in literature is a simultaneous process of their humanization and their dehumanization. [*A Dictionary of Modern Critical Terms, Ed. by Roger Fowler*]

আমরা জানি, নাটকে ঘটনার প্রাধান্য, মহাকাব্যে চরিত্রের। উপন্যাস, সমালোচকদের অভিমতে, মহাকাব্যের আধুনিক সংস্করণ। অতএব, উপন্যাসে ঘটনার চেয়ে চরিত্রের প্রাধান্য প্রত্যাশিত। চরিত্র বলতে ব্যক্তিবিশেষের কোনো বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য নয়, তার অন্তরঙ্গ দিকও থাকে, বিশেষত যা তার 'thought, speech, behaviour'-কে নির্ণয় করে। শ্রী অলোক রায়ের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, 'উপন্যাসের চরিত্র নবযুগের অভিঘাতে একাধিক বৃত্তির সংঘাত-সমন্বয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি চরিত্রকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। শ্রেণীগত পরিচয় অপেক্ষা ব্যক্তিগত পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির অন্তর্জগৎ অনির্দেশ্য রহস্যে ভরা, অনেকখানি অজানা, সেই জন্যই তাকে জানবার তীব্র বাসনা।' রোমান্সপ্রভাবিত বা রোমান্সের জগৎ অতিক্রম করে 'দুর্গেশনন্দিনী' পেরিয়ে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পৌঁছে আমরা চরিত্রকে স্বমহিমায় দেখতে পাই। 'রজনী'তে এসে জানতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধি, ঔপন্যাসিক 'চরিত্রের অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন।' 'চোখের বালি'তে এসে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের অন্তর্জগতের কথা প্রকাশে গুরুত্ব দিলেন। জানালেন, 'সাহিত্যের নবপদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাঁদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।' অর্থাৎ প্লটের সঙ্গে চরিত্রের সম্বন্ধের কথা আমরা জেনেছি। এই সম্বন্ধসূত্রে লক্ষ্য করি, organic plot বা দৃঢ়সংবদ্ধ-

গঠন উপন্যাস বৃত্তাকার বলেই চরিত্রের বিকাশ সেখানে 'পূর্বপরিকল্পিত', কিন্তু loose plot বা শিথিল সংবদ্ধ গঠন উপন্যাসে চরিত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচক এই দুই রীতির দৃষ্টান্ত এভাবেই উল্লেখ করেছেন, একদিকে আছে বিনোদিনী, কিরণময়ী, সুরেশ, অন্যদিকে শ্রীকান্ত, অপু, শিবনাথ (ধাত্রীদেবতা)। এ দুয়ের মিলন মিশ্রণও কিছু চরিত্রে দেখানো হয়েছে, যেমন শচীশ (চতুরঙ্গ), খগেনবাবু (অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা), বাদল (সত্যাসত্য)। প্লটের ধারণা ক্রমান্বয়ে ভেঙেচুরে যাচ্ছে, কালক্রমে শিল্পরূপের নানা পরীক্ষানিরীক্ষা সূত্রে চরিত্রের স্বরূপও কার্যত বিবর্তিত হয়ে চলেছে নতুন নতুন আঙ্গিকে, চরিত্রপ্রধান উপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস—এই সব পরীক্ষানিরীক্ষার ফল—এখানে মানব জীবনের অন্দরমহলে, গভীরে, যতই প্রবেশ করবার ইচ্ছা জেগেছে, চরিত্রের সংজ্ঞাও ততই বদলে যাচ্ছে। সমালোচকের অভিমত, 'ঔপন্যাসিক যেভাবে তাঁর জগতকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সেইভাবে ভাবিত হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, যে কোন চরিত্র উপন্যাসের তাগিদকে অস্বীকার করে ঘটনার ক্রমকে লঙ্ঘন করে স্বাধিকারের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এইটিই বোধ হয় তার শৈল্পিক সার্থকতার নিরিখ। মোটকথা, এই নিরিখের তুলাদণ্ডে ও চরিত্রের সামগ্রিক পূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে তার সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতা ও সার্থকতা।' [শিশির চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাসের স্বরূপ]।

সংলাপ [Dialogue]—নাটকই একমাত্র শিল্পকর্ম যার প্রতিটি গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে সংলাপের উপর। অধ্যাপক নিকল নাটকের বৃত্ত ও চরিত্রকেই নাটকের প্রাণ মনে করেন না, ডব্লু. এইচ. হাডসন বা হেনরি আর্থার জোনসের মতামত থেকে দূরবর্তী থেকেই তিনি জানান, সংলাপবর্জিত নাটক অর্থহীন। তাই নাটকে প্লটের নির্মাণও কথোপকথনে, সংলাপে। উপন্যাসেও সংলাপের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Cuddon নির্দিষ্ট ভাবে সংলাপ বা Dialogue বোঝাতে জানান, 'Two basic meanings may be distinguished ; (a) the speech of characters in any kind of narrative, story or play ; (b) a literary genre in which 'characters' discuss a subject at length.'

সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রকে চেনা যায়, একে অপরের সঙ্গে যখন কথোপকথন করে, তখন সেই কথকচরিত্রের মনোবৃত্তি, মনন, মেধা, বৌদ্ধিক মাত্রা, তার পেশা, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংলাপ চরিত্রানুগ না হলে তা অর্থবোধক হবে না। শিপলে ব্যাখ্যা করেছেন : 'Through the dialogue, the persons are balanced one against another, thus each the more fully portrayed.' তাঁর আরো বলার কথা, 'In fiction, furthermore, it adds variety, relief and greater naturalness ; by the necessary shift to the present tense, it brings the action nearer, makes it seem more swift and more intense.'

অতএব, সংলাপ উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। সংলাপের মধ্য দিয়েই চরিত্রসমূহ তার আবেগ ও অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা ও স্বপ্ন, ভালোলাগা মন্দলাগা—সবই প্রকাশ করে। অনেক সময়, চরিত্রে-চরিত্রে ডায়ালগে অনাবশ্যক তর্ক প্রাধান্য পায়, সেক্ষেত্রে তা উপন্যাসের উৎকর্ষ সাধন করে না, সমাজতত্ত্ব-বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি-শিল্পকলা নিয়ে তর্ক চলতে থাকলে চরিত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ও উপন্যাসের উৎকর্ষ হানি ঘটে। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' উল্লেখ করা যাবে। উপন্যাসে চরিত্রকথনরীতিতে চিন্তাস্রোত বা তর্কপ্রবণ কথকতা অনেক সময় কাহিনীর

গতি ক্ষুণ্ণ করে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সত্যাসত্য' এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। সেখানে বাদল-সুধী-উজ্জয়িনী প্রমুখ চরিত্রের ডায়ালগে এই ত্রুটি লক্ষিত হয়। সংলাপের ক্ষেত্রে আরো একটি ব্যাপার মনে রাখতে হয়—ঔপন্যাসিক ইচ্ছে মতন, প্রয়োজনে, আঞ্চলিক 'ডায়ালেক্ট' (Dialect)-এর আশ্রয় নিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবের ভাষা, বিবাদ-বিরোধ, গালমন্দ অবিকল উপস্থাপনা সংগত নয়, কেননা জরুরি নয় ; রবীন্দ্রনাথ একসময় বুঝিয়েছিলেন, সাহিত্যের মা যেমন করে কাঁদে, বাস্তবের মা তেমন করে কাঁদে না। হেনরি এনড্রু জোনস মন্তব্য করেছেন, 'In a quarrel that takes place in real life, you will find a great many undramatic repititons and anti-climaxes, and sometimes a vast amount of unnecessary language. On the stage all this has to be avoided.' [*The Renascence of the English Drama*]। উপন্যাসেও, জোনস-এর এই উক্তি, নির্দিষ্ট ভাবে সংলাপরচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বোঝাতে চান, 'ভাষা ও চরিত্রের প্রকাশ সংলাপে। সে সংলাপ প্রত্যেকটি চরিত্রের ব্যক্তিত্বের দ্যোতক হওয়া চাই।' এদিক থেকে, সাম্প্রতিক কালে, উপন্যাসে সংলাপ ব্যবহার বা প্রয়োগ সচেতন ভাবেই হচ্ছে। এক একটি সংলাপে, ভাষা ব্যবহারে চরিত্রের অন্তর্জগৎ অসামান্য ব্যঞ্জনা নিয়ে ফুটে উঠছে। যেমন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' বা 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে, নানা সময়ের সংলাপ। সবচেয়ে বড় কথা, উপন্যাসে সংলাপের অপরিহার্যতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবশ্যই লেখক সচেতন ও সতর্ক থাকবেন, তিনি সর্বদা চেষ্টা করবেন যাতে সংলাপ যেন কৃত্রিমতাবর্জিত ও স্বচ্ছন্দ হয়।

পটভূমি ও প্রতিবেশ [Setting and Milieu] : পটভূমি বা 'The Setting of a narrative or dramatic work is the general locale and the historical time in which its action occurs ; the setting of an episode or scene within a work is the particular physical location in which it takes place.' [M. H. Abrams] । সাধারণত যে স্থানে এবং যেকালে ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, তাই হল গল্প-উপন্যাস বা নাটকের সেটিং বা পটভূমি। 'উপন্যাসের পটভূমি বলতে ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে স্থান, কাল, প্রবহমান সমাজজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির সংস্থান বোঝায় ; এককথায় উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক—সাধারণত এই দুরকমের পটভূমি ব্যবহৃত হয়।' উপন্যাসের পটভূমি বড় বা ছোট হতে পারে। মহাকাব্যোপম উপন্যাসের পটভূমি যেমন বিস্তৃত হবে, প্রসারিত হবে, যেকোনো আধুনিক উপন্যাসে পটভূমি তেমন ব্যাপক নয়। উপন্যাসের গোত্রবিচার করলে দেখা যাবে পটভূমির কোনো নির্দিষ্ট মাপ নেই। শেকসপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের পটভূমি হচ্ছে মধ্যযুগীয় স্কটল্যান্ড এবং Setting for the scene in which Macbeth comes upon the witches is a blasted heath. জেমস জয়েসের *Ulysses* উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি হচ্ছে ১৯০৪ সালের ১৬ই জুনের ডাবলিন শহর এবং এর একেবারে প্রথম কাহিনীর পটভূমি হচ্ছে ডাবলিন উপসাগরের নিকটবর্তী মার্টেলো টাওয়ার। এডগার এলান পো, টমাস হার্ডি ও উইলিয়াম ফকনারের সাহিত্যকর্মে পটভূমি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা কাহিনীর 'atmosphere' নির্মাণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিবেশ বা 'milieu' পটভূমির বাস্তব তাৎপর্য পেরিয়ে এক বিস্তারিত প্রেক্ষিতকে সংকেত দেয়। প্রতিবেশ বা milieu হল

হিপোলাইট টেইন সূত্রে, 'With the race and the moment, as the determining factor in the production of art. Although mechanically pressed ('vice and virtue are products, like vitriol and Sugar') his points are driven by later Sociological critics. The influence of environment is esp. stressed by those that would radically change it.' [J. T. Shipley]।

উপন্যাস তো নিছক বাস্তবের বর্ণনা নয়, সেখানে লেখকের কল্পনাশক্তি ও বর্ণনাশৈলীর পুঁজিও জরুরি, যার সাহায্যে তিনি নির্মাণ করবেন পটভূমি ও প্রতিবেশ। যাবতীয় ঘটনা চরিত্র, তার সংযোগ থাকে পটভূমি ও প্রতিবেশের সঙ্গেই। পটভূমি ও প্রতিবেশ যদি উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক মূল্যে নির্ধারিত না হয়, তবে তার গুরুত্ব থাকে না। চরিত্র ও ঘটনার দিকে অভিনিবিষ্ট হলে পটভূমি আমাদের দৃশ্যের বাইরে চলে যায়। সমালোচকরা মনে করেন, 'চরিত্র এবং ঘটনাকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেই নিজে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে পটভূমির সার্থকতা।' এদিক থেকে আমরা দুধরনের পটভূমি লক্ষ্য করব, তন্ময় ও মন্ময় দৃষ্টিতে উপস্থাপিত পটভূমি। প্রথমটির সার্থকতা 'ঘটনাকে বিশ্লেষণ-করা। সেখানে পটভূমি বর্ণনার ও উপস্থাপনার মধ্যে সংযম অবশ্যপালনীয় শর্ত।' আর 'মন্ময়দৃষ্টিতে উপস্থাপিত পটভূমির সার্থকতা কেবল ততটুকুই যতটুকু তা চরিত্রের মনোভঙ্গির সঙ্গে অন্বিত।' কিন্তু উপস্থাপনকৌশলের দিক থেকে পটভূমি নানাপ্রকার হয়ে থাকে—১. ইতিহাসগত পটভূমি, ২. উপযোগমূলক পটভূমি, ৩. সাংকেতিক পটভূমি, ৪. পটভূমিসর্বস্বতা, ৫. মানসিক পটভূমি, ৬. বিচিত্রদৃষ্ট [Kaleidoscopic] পটভূমি।

১. *ইতিহাসগত পটভূমি* : ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাসগত। ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্লট ও চরিত্রের যেমন নাটকীয় বিন্যাস থাকে, তেমনি থাকে দেশ কালের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক পটভূমি। অনেকক্ষেত্রে, এই ধরনের উপন্যাসে তথ্য বিষয়ক সীমাবদ্ধতা থাকে বলেই লেখকের লক্ষ্য থাকে মূল কাহিনী চরিত্রের সহযোগে মানবিক সমস্যা-সম্পর্কের আলোকে উপস্থাপনা করা। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি কখনো কখনো বিরাট হয়ে দাঁড়ায়, লক্ষ্য হয়ে ওঠে ইতিহাস-রস সৃষ্টি করা। ইতিহাসের পটভূমিতে স্থানকালপাত্রকে সামনে রেখেই অনেকসময় লেখকের লক্ষ্য থাকে কোনো বৃহৎ জীবনসত্য, সমাজসত্য তথা মানবসত্যকে উন্মোচিত বা উদ্ভাসিত করা। পটভূমির গুরুত্ব মনে রেখেও বলতে হবে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে তথ্যসন্ধান ও জীবনসন্ধান, তথ্যসন্ধী ও সত্যসন্ধী হওয়ার অনিবার্যতা না মেনে উপায় নেই।

২. *উপযোগমূলক পটভূমি* : উপন্যাসে এই ধরনের পটভূমির গুরুত্ব খুব বেশি নয়। ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশে বা রূপনির্মিতির প্রয়োজনে এই ধরনের পটভূমির উপযোগিতা। 'চরিত্র ও ঘটনাকে পরিস্ফুট করার দিক দিয়ে অর্থাৎ নিতান্তই উপযোগিতার দিক দিয়ে পটভূমি উপস্থাপনার যতটুকু সার্থকতা।' উপযোগবাদের অন্তরায় হলে পটভূমির শিল্পমূল্য নষ্ট হয়ে যায়।

৩. *সাংকেতিক পটভূমি* : 'নিসর্গচিত্রের সংস্থাপন অনেকসময় মানবমনের প্রেক্ষিতে সংকেতধর্মী করে উপস্থাপিত করা হয়। অবশ্য সেখানে নিসর্গের রূপবৈচিত্র্য বড় কথা নয়, বড় কথা মানবমন।' সাংকেতিক পটভূমির উপস্থাপনা বিস্তৃত না হয়ে যত সংক্ষিপ্ত হবে তত ভালো, যত ব্যঞ্জনাময় হবে তত ভালো।

৪. *পটভূমিসর্বস্বতা* : অনেক উপন্যাসে দেখা যায় চরিত্র ও ঘটনার তুলনায় পটভূমিই ব্যাপক আধিপত্য কায়েম করেছে। উপন্যাস হয়ে উঠেছে পটভূমিসর্বস্ব। অর্থাৎ মনে হয়, পটভূমি উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'আরণ্যক' উপন্যাসে পটভূমির প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। সমালোচকের অভিমত, 'আরণ্যক-এ অরণ্যপটভূমি একটি বিস্ময়মিশ্রিত মুগ্ধতার দৃষ্টিতে দেখা বিষয়বস্তু মাত্র, জীবনজিজ্ঞাসাবর্জিত পটভূমিসর্বস্ব চলচ্চিত্র মাত্র। এ জাতীয় পটভূমিসর্বস্ব কাহিনীর নিজস্ব একটি মূল্য আছে একথা ঠিক, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এগুলির সার্থকতা কতখানি তা বিচার্য বিষয়।' বিচার্য বিষয় হলেও দেখা যাবে এটি স্বতন্ত্র স্বাদের অভিনব উপন্যাস। প্রাকৃতিক পটভূমির প্রাধান্য সত্ত্বেও এই উপন্যাসকে ভূমিলগ্ন মানুষের দলিলের শিল্পরূপ বলা অসংগত নয়। পটভূমিসর্বস্বতা সত্ত্বেও এটি উপন্যাস কিনা এ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। অবশ্য লেখকের সংশয় জেগেছিল বলেই তাঁকে কবুল করতে হয়েছিল, এটি ভ্রমণকাহিনী নয়, ডায়েরি নয়, এটি উপন্যাস।

৫. *মানসিক পটভূমি* · চরিত্রবিধৃত পটভূমি থাকলেও উপন্যাসে কখনো কখনো চরিত্রের মনোলোকে দেশকালের পটভূমি গড়ে উঠে, যাকে দ্বিতীয় পটভূমি বলা যায়। এই দ্বিতীয় পটভূমি বাস্তব পটভূমির সমান্তরাল ও বিপরীতধর্মী।

৬. *বিচিত্র দৃষ্ট (Kaleidoscopic) পটভূমি* : ক্যালিডোস্কোপ ঘোরালে যেমন অনেক ছবি অনেক দৃশ্য ফুটে ওঠে, উপন্যাসে, বিশেষত চেতনাপ্রবাহ অনুসরণে মানবমনের ভেতরই ব্যক্তিজীবনের ছবির পর ছবি, চিন্তানুষঙ্গ, ঘটনা ও উপলব্ধির নানা জগৎ কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। চিন্তাস্রোত ও চেতনাপ্রবাহে একই সময়ে নানা স্থানে, নানা কালে চরিত্র বিদ্যমান থাকতে পারে, তিনটি কালদণ্ডে একই সময়ে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে চরিত্রের চলাচল সম্ভব। এই সূত্রেই বলা যায়, আধুনিক উপন্যাসে চরিত্রের পটভূমি বিচিত্রদৃষ্ট।

শৈলী [Style]—স্টাইল বা শৈলী মূলত লেখক-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ; উপন্যাস যেহেতু কথাসাহিত্য, অতএব শব্দ, বাক্য, চিত্রকল্প, অলংকার, কথাচ্ছবির সমাহারে বাণীরূপ গড়ে তোলেন শিল্পী। এই উপায়-উপকরণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে যে লেখকব্যক্তিত্ব, তাকেই স্টাইল বলা হয়। যে ছয়টি গুণের সমবায়ে স্টাইলের পূর্ণতা তা হল, স্বচ্ছতা, সরলতা, পরিমিতি, বৈচিত্র্য, নাগরিকতা, সরসতা। স্টাইলের সমস্যা বোঝাতে গিয়ে স্তাঁদাল বলেছিলেন, 'Style is this : to add to a given thought all the circumstances fitted to produce the whole effect which the thought is intended to produce.' সমালোচকের অভিমত, স্তাঁদাল চিন্তা বা 'থট'কে ব্যাপক অর্থে বুঝিয়েছেন—ইনটুইশন, কনভিকশন, পারসেপশন, ইমোশন—সব কিছুই 'থট'-এর অন্তর্ভুক্ত, মোদ্দা কথা, স্টাইল হল, 'একাধারে ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত, লেখক-ব্যক্তিত্বের শিল্পসম্মত প্রকাশ।'

'Style' শব্দটি এসেছে লাটিন 'Stilus' থেকে ; Stilus হল, 'an instrument used to write with upon waxed tablets.' লাতিন থেকে শব্দটি এলেও গ্রীকরা 'স্টাইল' সম্পর্কে উন্নত চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবিচার পদ্ধতিতে 'রীতি' কথাটি সুবিদিত। বামন বলেছিলেন, 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ', তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য, 'রীতিরাত্মাকাব্যস্য।' কিন্তু সংস্কৃতে 'রীতি' ও ইংরেজী 'Style'-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। রীতি হচ্ছে শিল্পসমন্বিত বহিরঙ্গগত রচনাপদ্ধতি, Style হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন। ফলে 'বিষয় ও বিষয়ীর যে ভেদ, রীতি ও Style-এর মধ্যেও সেই

ভেদ'। আবার, 'Style' ও 'Stylistics'—শৈলী ও সাহিত্য শৈলীবিজ্ঞান এক ব্যাপার নয়। কাব্যজিজ্ঞাসার পাঠক মাত্রেই জানেন, রীতি কাব্যের শেষ কথা নয় ; রস ও ধ্বনির চর্চায় তা ঋদ্ধ। পাশ্চাত্যে Style-এর চর্চা দুহাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্লেটো ও আরিস্ততল যথাক্রমে আদর্শবাদী ও বস্তুবাদী Style-এর আদি প্রবক্তা। ১৯৬৯-এ সেরবেলেনি Style সংক্রান্ত Symposium-এর ভূমিকায় Style-কে অনেকার্থক বা ambiguous বলেছিলেন। বোধ হয়, কথাটি যথার্থ। বুফো যখন বলেন, 'Style is the man,' ম্যাথু আর্নল্ড যখন বলেন, 'a peculiar recasting and heigtening', সোপেনহাওয়ার যখন বলেন 'physiognomy of the mind' তখন অনেকার্থেরই সন্ধান মেলে। আবার, ক্রিস্টাল ও ডেভি স্টাইলের মাত্রা বলতে 'individuality, dialect, time, province, status, modality, singularity' বুঝিয়েছেন। বিষয় ও শৈলীর অবিচ্ছেদ্যতাকে মনে রাখতে হবে এই জন্য যে বিষয় ও ভাবনানুসারে শৈলীর পরিবর্তন ঘটে থাকে।

Cuddon জানিয়েছেন, 'The analysis and assessment of style involves examination of a writer's choice of words, his figures of speech, the devices (rhetorical and otherwise), the shape of his sentences (whether they be loose or periodic), the shape of his paragraphs—indeed, of every conceivable aspect of his language and the way in which he uses it.' লেখকের রচনার মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বর, হাসি হাঁটাচলা, হস্তাক্ষর এবং মুখের রেখায় রেখায় ভাবপ্রকাশ ঘটে অর্থাৎ বুফোঁর উক্তি যথার্থ style is the man, কোনো কথাকার কিংবা কবি, লেখক বা সাহিত্যিককে স্বতন্ত্র ভাবে চিনে নেবার উপায় হল স্টাইল। স্রষ্টার প্রকাশভঙ্গির মৌলিকত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে স্টাইলের পরিচয়।

সব উপন্যাসের একই রকম শৈলী অকল্পনীয়, অবাস্তব। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন স্বাদের উপন্যাসে, বিভিন্ন শিল্পকৌশল লক্ষ্য করব। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা ও শৈলী এক নয়। তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণের উপন্যাসের শৈলী এক হতে পারে না। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, পুতুলনাচের ইতিকথা ও পথের পাঁচালীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষারীতি, বয়নকৌশল ও শিল্পরূপ। 'কপালকুণ্ডলা'র গদ্য, ভাষা, আঙ্গিক এবং শ্রীকান্তর রচনারীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এভাবেই ডিকেন্স বা থ্যাকারের গদ্যরীতির সঙ্গে ভার্জিনিয়া উলফ বা জেমস জয়েস, কামু কিংবা কাফকার তুলনা চলে না। উপন্যাসে শৈলী কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে নির্ধারিত নয়।

উপন্যাস ও নাটক

উপন্যাস ও নাটক দুটি আলাদা শিল্পরূপ বা Artform। সময়ের দিক থেকে নাটক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। নাটক ও উপন্যাসের উপাদান, বিষয়বস্তু, উপস্থাপনভঙ্গি—নানা দিক থেকেই উভয়ের সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি। ফলে উপন্যাসবিচারে নাটকের পরিভাষা ব্যবহারের প্রবণতা থাকে। কিন্তু উভয়ের মৌলিক পার্থক্যটুকু মনে রাখা জরুরি। 'আমরা যে-বাসনা নিয়ে নাটক দেখতে যাই, অথবা যে-আবেগ নিয়ে একটি কবিতা পড়ি সেই বাসনা এবং আবেগকে আমরা যেমন চিনি এবং জানি, উপন্যাসের কাছে আমাদের প্রত্যাশাকে তেমন করে আমরা জানি চিনি কিনা এর ওপরেই সার্থক উপন্যাস বলতে সঠিকভাবে আমরা কী বুঝি তার উত্তর নির্ভর করবে। নাটকে জীবনের ব্যাখ্যাকে আমরা হৃদয়স্থ করি দৃশ্যের মাধ্যমে। নাটক দৃশ্যমাধ্যমী জীবনব্যাখ্যা। যেহেতু নাটকের প্রাথমিক আবেদন প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের শ্রুতির কাছে এবং দৃষ্টির কাছে তাই সংক্ষিপ্তি নাটকের মূল লক্ষ্যের অন্যতম। এই সংক্ষিপ্তিকে শিল্পোজ্জ্বল করতে গিয়ে নাট্যকার জীবন থেকে ঘটনা এবং চরিত্রকে নাটকের মতো করে, নাট্যকারের মনোভাব নিয়ে নির্বাচন করেন। ঘটনার এবং চরিত্রের স্ব স্ব অথবা পরস্পর দ্বন্দ্ব নাটকের অনিবার্য বিষয়। নাট্যকারের এই বিষয় বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্য নাট্যসূত্রের একটি প্রধান নির্দেশের ভিত্তি-নির্ভর। সেটা হল সময়ের অতিপাত। সময়ের অতিপাত বা passage of time নাটকের প্রধান কথা। এই সময়ের অতিপাতকে নাটকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার না করলে অতি বিশিষ্ট চরিত্র-কল্পনাও হানিগ্রস্ত হয়।' [বাংলা উপন্যাসের কালান্তর]। কিন্তু উপন্যাসে, নাটকের মতন, এরকম কোনো কঠিন নিয়ম নেই। এছাড়াও, এই সূত্রে, আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, 'নাট্যকারকে শুধু নাটক জানলেই চলে, কবিকে শুধু কবিতা। কিন্তু উপন্যাসকার জানেন যে জীবন শুধু নাটক নয়, শুধু কবিতাও নয়। তিনি জানেন যে জীবন নাটক, কাব্য, কাহিনী এবং হয়তো আরো অনেক কিছু। তাই উপন্যাস সর্বগ্রাসী।'

নাটক নিছক সাহিত্য নয়, অভিনয়কলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অভিনয়শিল্পের মধ্য দিয়ে নাটক যেভাবে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে ওঠে, উপন্যাসে তা সম্ভব নয়। সেখানে পাঠককে তার কল্পনাশক্তি, গ্রহণশক্তি ও বিচারশক্তি দিয়ে উপন্যাস আস্বাদন করতে হয়। নাট্যকারকে অভিনয়শিল্প, মঞ্চবিজ্ঞান, আলো, আবহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। নাটকের গঠন উপন্যাসের তুলনায় অনেক বেশি সুদৃঢ়। নাটকে থাকে প্লট, চরিত্র, সংলাপ, কালগত ঐক্য, বাচনশৈলী। নাটকের মধ্যে স্থান, কাল, উদ্দেশ্যগত এক অখণ্ড ঐক্য রক্ষা জরুরি, উপন্যাসে তার প্রয়োজন হয় না। নাটক মঞ্চনিয়মের অধীন হলেও উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা। অবশ্য Marion Crawford উপন্যাসকে নাম দিয়েছেন 'Pocket theatre'। কারণ উপন্যাসেও প্লট আছে, বিষয়বস্তু আছে, অভিনেতারা আছে, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা—নাটকের বিভিন্ন উপকরণ আছে। কিন্তু নাটক মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, উপন্যাস তেমন কোনো ধরাবাঁধা সীমায় আবদ্ধ নয়। ব্যাপক বিস্তৃত মানবজীবনে তার অন্তহীন চলাফেরা। উপন্যাসে নাটকের মতন সংলাপ আছে ঠিকই, কিন্তু উপন্যাস নাটকের মতন নিছক সংলাপনির্ভর নয়। নাটকের মতন উপন্যাসের আখ্যানে সংঘাত ও ঘটনাবলী থাকে। কিন্তু নাটকের আঙ্গিক বা গঠনের মতন উপন্যাসের আঙ্গিক বা গঠন নিয়মবদ্ধ নয়। হাডসনের ওই অভিমত সত্য,

'The drama is the most rigorous form of literary art ; prose fiction is the loosest.' ঔপন্যাসিকের যথেচ্ছ স্বাধীনতায় সম্ভব হয় নানামাত্রিক জীবনের জটিল অভিজ্ঞতা ও সত্যকে ফুটিয়ে তোলা।

একটি বিশেষ প্রবণতার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য, উপযুক্ত নাটকের অভাবেই হয়ত কোনো কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেরই নাট্যরূপান্তরের কথা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসেরই নাট্যরূপের কথা আমরা জ্ঞাত আছি। নাট্যবিশেষজ্ঞের অভিমত, 'কোন কোন ঔপন্যাসিকের কিংবা কথাসাহিত্যের কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে অনেক সময় নাটকীয় গুণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, কিন্তু মূলত উপন্যাস নাট্যধর্মী রচনা নয়। কথাসাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে, তা নাটকের ভিতর দিয়ে যথার্থ-বিকাশ লাভ করতে পারে না। সুতরাং যা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, তা একান্তভাবে নাটকের মধ্যে গৃহীত হতে পারে না। তবু কোন কোন উপন্যাসের মধ্যে ঘটনা বাহুল্য কিংবা নাট্যিক ক্রিয়ার (action) প্রাধান্য দেখা যায়, কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ নাট্যধর্মী তা সর্বদা বলা যায় না। কোন কাহিনীতে ঘটনার বাহুল্য থাকলেই তা নাটকের উপযোগী হয় না ; বিশিষ্ট প্রকৃতির ঘটনাই নাটকের উপজীব্য, ঘটনামাত্রেই নাটকের উপজীব্য নয়।' [আশুতোষ ভট্টাচার্য : উপন্যাস ও নাটক, অলোক রায় সম্পাদিত সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য]।

উপন্যাস ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে মন্তব্য করেছিলেন, 'মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডৌল, বাইরে তার রং রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা কটু। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটগল্প।' [শেষ কথা, দেশ, ১৩৪৬, ৩০শে অগ্রহায়ণ, রবীন্দ্ররচনাবলী (২৫ খণ্ড) তিনসঙ্গীর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন, ছোটগল্প আকৃতিতে ছোট, গঠনে সংহত, নিটোল সুডৌল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ছোটগল্প সর্বদা আকৃতিতে ছোট হয় না। রবীন্দ্রনাথের মেঘ ও রৌদ্র, নষ্টনীড় আকারে ছোট নয়। কিংবা ছোট নয়, মপাসাঁর মাদার টেলিয়ার্স এস্‌টাব্লিশমেণ্ট, মমের রেন কিংবা গোগোলের ওভারকোট। আমরা বলব, ছোটগল্প, সাধারণভাবে আকৃতিতে ছোট। তার লক্ষ্য চরিত্রবিস্তার বা বিবর্তন নয়। একটি বিশেষ মুহূর্তের অভিজ্ঞতা, বা একটি চূড়ান্ত মুহূর্ত ছোটগল্পের আশ্রয়।

সমারসেট মম বলেছিলেন, একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ হিসেবে ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে। মুদ্রণযন্ত্র ও পত্রপত্রিকার সুবাদে ছোটগল্পের বিকাশ বিস্তার ত্বরান্বিত হয়। এডগার অ্যালেন পোর বক্তব্য ছিল, ছোটগল্প এমনই এক prose fiction যা পড়তে আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা সময় লাগে। এইচ জি ওয়েলস-এর মতে, ছোটগল্প দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া কাম্য। ছোটগল্পের বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে জীবন এবং জীবনেরই খণ্ড রূপ। অখণ্ড জীবনপ্রবাহ বা একখানি গোটা জীবন ছোটগল্পে স্থান পেতে পারে না, কিন্তু একটি অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ দিতে পারে। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বাংলা ছোটগল্প' বই থেকে জানা যায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সুচিন্তিত বক্তব্য 'কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোটগল্প সেইরূপ জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয়ত যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি কয়েকছত্র মাত্র অধিকাব করিতে পারে, ছোটগল্পে তাহাই পাঁচসাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে 'বুলস আই' লণ্ঠনের আলো যেমন একস্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোটগল্প রচনার কৌশল তেমনি জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাই সেই লণ্ঠনের আলোর কার্য। তেমনি বিচিত্র সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, উত্থান, পতন সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনাই অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দান করাই গল্প রচনা কৌশলের কার্য।' উপন্যাসে ছোটগল্পের মতন একটা গল্প থাকলে সেখানে গল্প বা কাহিনী বিস্তার লাভ করবে, নানামুখী হবে ; ছোটগল্পে প্রতিপদ্য বিষয় হবে একটিমাত্র, তার লক্ষ্য হবে একমুখী। ছোটগল্প বড় করলে উপন্যাস হবে না, উপন্যাস ছোট করলে ছোটগল্প হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়', সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনী', রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'কে 'বড় ছোটগল্প' [Long Short Story] বলতে

সমালোচকের আপত্তি থাকে না। কিন্তু এদের আকার বিস্তৃততর হয়ে রসপরিণাম খণ্ডিত করলে তা উপন্যাসিকা বা Novelette পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

ছোটগল্পে যে নিটোল সংহতির কথা বলা হয়, তার একটি নির্দিষ্ট ছক বা পরিকল্পনার কথা বলা হয়, আরিস্টটল কথিত আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত তার গঠন বিশিষ্টতার কথা বলা হয়, উপন্যাসেও সেরকমই একটি পরিকল্পনা থাকতেই পারে ; কিন্তু তার কাঠামোর সংহতি বা সংগঠন সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো অনুশাসন নেই। সাধারণভাবে ছোটগল্প ও উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে এই ক্ষেত্রে যে উভয় শিল্পকৌশলেই প্লট, চরিত্র, সংলাপ, সময়, ঘটনাস্থল পরিবেশ ইত্যাদি থাকে। কিন্তু গল্পের বিষয় ধরা বাঁধা নেই, উপন্যাসের বিষয় অবশ্যই মানুষ ও লক্ষ্য মানবচরিত্র বিশ্লেষণ। অথচ গল্পদেহের নির্দিষ্ট কাঠামো থাকায়, ঔপন্যাসিকের মতন গল্পকারের স্বাধীনতা বিশেষ নেই। ঔপন্যাসিক স্বচ্ছন্দ, অবাধ। কিন্তু গল্পকারের দায়িত্ব নির্ধারিত। 'উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় গল্প যেন দীর্ঘ লিরিক কবিতার পাশে একটি সনেট।' জীবন জটিল, ছোটগল্পকার জীবন থেকে ছেঁকে নেন খণ্ড মুহূর্তকে ; উপন্যাস ছোটগল্পের তুলনায় অনেক জটিল, কেননা ঔপন্যাসিক জটিল জীবনের অনেকটাই ধরে রাখতে পারেন তাঁর উপন্যাসে।

ছোটগল্পে প্লট থাকে একটি। উপন্যাসে অনেক প্লট। প্রধান প্লট ছাড়াও তাতে সাবপ্লট থাকতে পারে ; থাকতে পারে একাধিক প্লট ও একাধিক চরিত্র। ছোটগল্পের শৈলী ও উপন্যাসের শৈলীও এক হতে পারে না। ছোটগল্পে শব্দব্যবহারে মিতব্যয়ী না হয়ে উপায় নেই, কেননা, ছোট স্পেসে মহৎ কথা গুরুতর কথা বলতে গেলে শব্দকে লক্ষ্যভেদী হতে হবে। উপন্যাসে অবশ্যই শব্দের ব্যবহার যথাযথ হওয়াই কাম্য, কিন্তু ছোটগল্পকারের মতন মিতব্যয়ী না হলেও ক্ষতি নেই। ছোটগল্প হল 'moment's monument', আমরা যাকে বলি ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের, তুচ্ছের মধ্যে মহতের, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দর্শন। উপন্যাস কিন্তু সমগ্র মানবজীবনের কথাচ্ছবি। 'সাহিত্যসন্দর্শন'কারের অভিমত, 'উপন্যাস পাঠককে সবই বুঝাইয়া দেয়, ছোটগল্প তাহাকে বুঝিবার অবকাশ দেয়। সুতরাং যে-লেখক বৃহৎ আখ্যানরচনায় সিদ্ধহস্ত, যিনি বহুবিধ চরিত্রসৃষ্টিতে নিপুণ, এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় অনলস, তাঁহার পক্ষে ছোটগল্প লেখক না হইয়া ঔপন্যাসিক হওয়া শ্রেয়ঃ। কিন্তু যিনি আখ্যানভাগ অপেক্ষা চরিত্র সৃষ্টিতে অধিকতর পটু, যাঁহার পরিতৃপ্তি অপেক্ষা ইঙ্গিতের দিকেই লক্ষ্য বেশী, তাঁহার পক্ষে উপন্যাস না লিখিয়া ছোটগল্প লেখাই বিধেয়।' কিন্তু এভাবে অনুশাসন প্রদান হয়ত যুক্তিসঙ্গত নয়। নিঃসন্দেহে ছোটগল্প ও উপন্যাস দুটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম, ছোটগল্প লিখে যেভাবে কোনো লেখক স্বস্তি পান, উপন্যাসে নাও পেতে পারেন। কিন্তু ছোটগল্প ও উপন্যাস পাশাপাশি লিখে স্মরণীয় হয়েছেন অনেকেই ; বিশ্বসাহিত্যে ও আমাদের বাংলা সাহিত্যে রয়েছে এর অজস্র দৃষ্টান্ত। আটত্রিশ বছর ধরে [১৯৬০-১৯৯৮] হাসান আজিজুল হক খান পঞ্চাশেক গল্প লিখেছেন ; তাঁর 'শকুন' [১৯৬০] প্রথম গল্প আজো যেমন আধুনিক, তেমনি আজো তাঁর গল্প আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, স্বপ্ন দেখায়, ভাবায়। উপন্যাস লেখায় তিনি প্রাণিত নন। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দুটি ক্ষেত্রেই অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস 'লাল সালু' 'চাঁদের অমাবস্যা' 'কাঁদো নদী কাঁদো' এবং ছোটগল্প গ্রন্থ 'নয়নতারা' 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছে। পাশাপাশি, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস

'চিলেকোঠার সেপাই', 'খোয়াবনামা' এবং ছোটগল্পগ্রন্থ 'অন্যঘরে অন্যস্বর', 'দুধভাতে উৎপাত', 'দোজখের ওম', 'খোয়ারি', 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' তাঁকে অনন্যকীর্তির অধিকারী করেছে। অর্থাৎ ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখায় লেখকের সমস্যা সামর্থ্যের অভাবে, অন্য কারণে নয়।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, ছোটগল্প ও উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সংক্ষেপে এভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন, 'উপন্যাস যেমন কাহিনীর বিকাশ, বিস্তার, প্রসারিত ব্যাখ্যা ও সমীক্ষা, চিন্তাপ্রতিচিন্তা, ঘাতপ্রতিঘাত—সব কিছু নিয়ে পূর্ণতাকে স্পর্শ করে, ছোটগল্প তেমনি মুহূর্তজীবী বিদ্যুৎবিকাশেই তার বক্তব্যকে শেষ করে জীবনের দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত করে দেয়, উপকরণের বিস্তার নয়, সযত্নে নির্বাচিত কয়েকটি উপকরণ নিয়েই ছোটগল্পে ব্যঞ্জনার অখণ্ড আকাশে উধাও হতে চায়। উপন্যাস যদি একটি বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের অসংখ্য মৃত্যুদৃশ্যের ও পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে চায় মনুষ্যত্বের মহৎ অপচয়, ছোটগল্প সেই মহৎ অপচয়কেই ফুটিয়ে তুলবে একটি সৈনিক তরুণের মৃত্যুতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের নীরব অশ্রুপতনের ছবিতে।' [সাহিত্যের রূপ-রীতি]।

রোমান্স

রোমান্সকে মুখ্যত 'a form of entertainment' বলা হয়ে থাকে। এটি মূলত একটি 'ইউরোপীয়ান ফর্ম' যা কিনা Arabian Nights-এর মতো সংকলন দ্বারা প্রভাবিত। রোমান্সের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে : "This suggests elements of fantasy, improbability extravagance and naivety. It also suggests elements of love, adventure, the marvellous and the 'mythic'. For the most part of the term is used rather loosely to describe a narrative of heroic or spectacular achievements, of chivalry, of gallant love, of deeds of derring-do." [J. A. Cuddon : The Penguin Dictionary of Literary Terms And Literary Theory]।

রোমান্স ও রোমাঞ্চ— সমার্থক নয়। রোমাঞ্চ বা শিহরণ মানসিক, আর 'রোমান্স' পাঠের শেষে রোমাঞ্চিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। একদা রোমান্স বলতে বোঝাত ভাষা,—লাতিন বা রোমান থেকে আগত ভাষা। কারো মতে, এটি ইতালি থেকে আগত। দ্বাদশ শতাব্দীতে রোমান্স-এর জন্ম ফরাসি দেশে। প্রাচীন ফরাসিতে নাইটদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর প্রচলন ছিল। একেই সাধারণভাবে রোমান্স বলা হতো। "পৃথিবীর সর্বত্রই রোমান্স-সাহিত্যের জন্ম মধ্যযুগে। মধ্যযুগের আলোআঁধারি ছায়ালোকে যে সাহিত্য গড়ে উঠলো তার সঙ্গে জীবনের যোগ ছিল অকিঞ্চিৎকর। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পুরোহিততন্ত্রের নির্দেশে প্রাচীন যুগে ধ্রুপদী সাহিত্যের পরিবর্তে পুরাণ ও ধর্মকথার প্রসার যেরকম অপ্রতিরোধ্য হলো, তেমনি সাহিত্যে প্রবেশ করল পলায়নী মনোবৃত্তি, প্রশ্রয় পেল অলৌকিকতা, রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে দেখা হলো জগৎ ও জীবন। অন্য দিকে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে তখন সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সমাজের উপরতলা ও নিচের তলার মধ্যে ভেদ ক্রমবর্ধমান। এ অবস্থায় অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য যে সাহিত্যসৃষ্টি তার নাম রোমান্স।" [অলোক রায়, রোমান্স, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য]। ডঃ কেট্‌ল মন্তব্য করেছেন, রোমান্স হল কল্পনানির্ভর অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় পুষ্ট অভিজাত সাহিত্য।

রোমান্সের জগৎ লোকায়ত জীবনজগৎ নয়। দৈনন্দিনের তুচ্ছ সাধারণ মানুষ রোমান্সের উপজীব্য নয়। ইচ্ছাচালিত কল্পনা ও সম্পূর্ণ ideal-এর জগৎ রোমান্স। রোমান্সরস নিচের তলার মানুষ উপভোগ করলেও রোমান্সের জগৎ একটি আদর্শায়িত জগৎ, যা সামন্ততান্ত্রিক বা অভিজাত সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নপূরণেরই পরিচয়বহ। এই জগৎ ভালো আর মন্দ—অবিমিশ্র ভালো আর অবিমিশ্র মন্দ—এই দুরকমের মানুষ নিয়েই গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভালো আর মন্দের সংঘাত এবং ভালো-র জয় রোমান্সের অন্বিষ্ট। রোমান্স কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগের সমাবেশে বর্ণাঢ্য। 'রোমান্স এক স্বপ্নময় জগৎ গড়ে তোলে—ধূসর, অস্পষ্ট, কল্পনা দিয়ে গড়া। বীরত্ব, শৌর্য, প্রেম, দুঃসাহস, অভিযাত্রা—এই হলো মধ্যযুগের রোমান্সের বিষয়। সাহসী রাজপুত্র, অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা, দুষ্ট রাক্ষস বা যাদুকর ; আর আদর্শায়িত প্রেম। মধ্যযুগীয় রোমান্সে সর্বদাই একটা নীতি-বাক্য লুকিয়ে থাকতো। আসলে রোমান্সের জন্মলগ্নে একদিকে যেমন রাজসভার প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি মঠমন্দিরের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব অলক্ষ্যে কাজ করেছে। সৎ লোক জয়লাভ করবে এবং অসৎ লোক শাস্তি পাবে—

এ সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত, এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।' Cuddon-এর ব্যাখ্যায় 'In medieval romance there were three main cycles : (a) the matter of Britain, which included Arthurian matter derived from Breton lays ; (b) the matter of Rome, which included stories of Alexander, The Trozan wars and Thebes ; (c) the matter of France, most of which was about Charlemagne and his knights.'

রোমান্সের ইতিবৃত্ত খুবই কৌতূহলপ্রদ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, তিনজন জার্মান কবি উল্লেখযোগ্য রোমান্স রচনা করেছিলেন—Hartmann von Aue-এর লেখা *Iwein* (১২০৩), Gottfried von Strassburg-এর লেখা *Tristan und Isult* (১২১০) এবং Wolfram von Eschenbach-এর লেখা *Pargifal* (১২১০)। ইংল্যাণ্ড দুই মহৎ রোমান্স উপহার দিয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে—একটি জনপ্রিয় *Lay of Hovelok the Dane* এবং *Sir Gawin and the green knight* নামে অভিজাত রোমান্স। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গদ্য রোমান্সের সৃষ্টি লক্ষণীয় হয়ে উঠল। রেনেসাঁসে-র কালে রোমান্সের চরিত্রবদল হল—কাব্যে অ্যারিস্টো এবং ট্যাসো, স্পেন্সারের *Faerie queene* এবং অন্যান্য রচনাসমূহে। এলিজাবেথানদের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিল—লোককথায়, নানাকর্মে। এই সময়ে গদ্যে লেখা প্রধান দৃষ্টান্তরূপে স্যার ফিলিপ সিডনির *Arcadia* (১৫৯০) উল্লেখযোগ্য। খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রীন-এর *Pandosto* (১৫৮৮), গদ্য রোমান্স। এই সময় রোমান্সের উপাদান, শুধু পদ্য বা গদ্য কাহিনীতে নয়, কিছু নাটকে, নির্দিষ্টভাবে রোমান্টিক কমেডিতে লক্ষ্য করা গেল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি চসারের ব্যঙ্গাত্মক রোমান্স রচিত হল *Tale of Sir Thopas*', বলা হচ্ছে 'by means of burlesque'। সারভান্তেস-এর 'ডন কুইকজোট (Don Quixote) -এর পূর্ব পর্যন্ত, আমরা প্রচলিত ধারা রূপে এই বিদ্রূপায়িত রোমান্সের পরিচয় পেয়েছি। ডন কুইকজোটের প্রথম খণ্ড বার হল ১৬০৫-এ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬১৫ সালে। বইটি প্রকাশ পেল ইংরাজিতে ১৬১২-২০, ফরাসিতে ১৬১৪-১৮ এবং ইতালিতে ১৬২২-২৫ এবং জার্মানিতে ১৬৮৩ সালে। ডন কুইকজোটকে আধুনিক উপন্যাসের 'পূর্বভূমিকা' বলা যেতে পারে। সমালোচকদের এই অভিমত সত্য যে, 'মধ্যযুগীয়তা ও মধ্যযুগীয় রোমান্স-এর ধারাকে যে সারভেনটিস বহন করলেন না, তার কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাদের অন্তঃসারশূন্যতা।' তাঁর মনে হয়েছিল, 'Nothing but your nature is your business.' তাঁর পূর্ববর্তী রাবলে (Rabelais)-র রচনার ফলে লক্ষ্য করা গিয়েছিল অভিজাততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের শঙ্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত, ডন কুইকজোটের পর থেকে রোমান্সের চরিত্রও বদলে গেল।

মধ্যযুগের অবসানে একদিকে উপন্যাসের জন্ম অন্যদিকে রোমান্সের প্রচলিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মধ্যযুগীয় রোমান্সের রূপকাবয়বে বিশিষ্ট হয়ে ওঠা জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরিত প্রকাশমানসের দৃষ্টান্ত। রোমান্টিক যুগে, রোমান্সের ধারণা ও 'রোমান্টিক' বলতে যা বোঝায়, পরিবর্তিত তাৎপর্যে চিহ্নিত হল। 'In the 18th c. the term 'romantic' meant something that could happen in a romance (or, to use the French word, it was *romancsque*,) but towards the end

of the 18th c. and at the beginning of the 19th it becomes clear that romance connotes those flights of fancy and imagination which had been regarded with suspicion in the Augustan Age" (Codden)। fancy ও imagination-এর পার্থক্য বা প্রভেদ নির্ধারণের তর্কে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'গভীর জীবনদর্শন ও প্রত্যয়।' রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের যুগে রোমান্সের পুরনো ধারণা বদলে গেছে সন্দেহ নেই। কল্পনার জগৎ, লৌকিক ও অতিলৌকিকের উপাদান আধুনিক রোমান্সে প্রতীকী প্রয়োগে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। যে রোমান্টিক কবি কোলরিজ তাঁর 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া'য় (চতুর্দশ পরিচ্ছেদে) রোমান্টিক কাব্যাদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে পেয়ে যাই তাঁর 'ক্রিস্টাবেল' 'দি এনসেন্ট ম্যারিনার' রচনায়। এছাড়া, শেলী, কীটস, ওয়ালটার স্কটের দীর্ঘ কবিতা তো আছেই।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে বিশেষত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে যেমন অতি-লৌকিকতা ছিল, তেমনি রূপকধর্মিতা ছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে, আধুনিক উপন্যাসের কিছু লক্ষণ চণ্ডীমঙ্গলে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত, যার ফলে, এরকম ধারণা হয়েছে, কবি মুকুন্দ একালে জন্মগ্রহণ করলে ঔপন্যাসিক হতেন। একালের সমালোচক তো শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেও উপন্যাসলক্ষণ খুঁজে পান। মধ্যযুগীয় রোমান্সের সঙ্গে আধুনিক রোমান্সের চরিত্রের প্রভেদ স্বভাবত ও কালোচিত সূত্রেই ঘটেছে। আপাত অর্থে আধুনিক রোমান্সে 'ঘটনার চমৎকারিত্ব, অ-লৌকিকতা, অবিমিশ্র ভালো আর মন্দের অবতারণা—সবই আছে।' কিন্তু তার অন্তর্নিহিত স্বরূপটি ভিন্ন। 'রোমান্টিক যুগে ঘটনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চরিত্র, কখনো ঐতিহাসিক কখনো মিশ্র বাস্তবাশ্রিত, যার যোগ নিঃসন্দেহে বর্তমানের সঙ্গে। অলৌকিকতা আর ঘটনার উপর নির্ভর করে না ততখানি, যতখানি করে আবহ রচনার উপর। ভালো মন্দের বোধ নির্দেশিত হয় রোমান্টিক আদর্শবাদের প্রেরণায়। লঘুপক্ষ স্বেচ্ছাবিহারী-অসংযমী কাল্পনিকতা শুধু নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তার স্থান নিয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যসন্ধানী-আত্মচালিত পরিকল্পিতা।' উনিশ শতকে অসংখ্য ঔপন্যাসিক বিচিত্র ধরনের রোমান্স রচনা করেছিলেন। যেমন স্যার ওয়ালটার স্কট, ন্যাথানিয়েল হথর্ন এবং জর্জ মেরেডিথ। যদিও স্কটের অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রাচীনতর রোমান্সরসসমৃদ্ধ, তবু তাঁর জীবনদৃষ্টিতে বাস্তবতার অভাব ছিল না। হথর্ন ও মেরেডিথ-এর রচিত রোমান্স সমকালীন প্রতিবেশ ও পরিপার্শ্ব থেকেই পরিপুষ্ট। হথর্নের *The House of the Seven Gables* (১৮৫১), *The Marble Fann* (১৮৬১) এবং মেরেডিথের *The Adventures of Henry Richmond* (১৮৭১) রোমান্সের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই সময়ের কথাসাহিত্যে বাস্তবতাবাদই প্রধান প্রবণতা হলেও তা প্রকৃতিবাদ-নির্ভরও হয়ে উঠতে থাকে, ফলে রোমান্সের চরিত্র এই প্রবণতার সঙ্গে কচিৎ সঙ্গতিপূর্ণ লক্ষ্য করা যায়। কাডন-এর অভিমত, 'A score of other writers in the last 80-odd years might be cited as romancers.' এখানে প্রসঙ্গত কনগ্রেভের *Incognita* (১৭১৩)-র ভূমিকায় এঁদের রচনার পরিপ্রেক্ষিতে, যা বলা হয়েছে, তা উল্লেখ করা-ই যেতে পারে—'Romances are generally composed of the Constant Loves and invincible Courages of Heroes, Heroins, Kings and Queens, Mortals of the first Rank and so forth ; where lofty language, miraculous of contingencies and impossible performances, elevate and

surprize the Reader into a giddy Delight whenever he gives of, and vexes him to think how he had suffer'd himself to be pleased and transported, concern'd and afflicted at the several Passages which he has Read, viz. these Knights Success to their Damozels misfortunes and such like, when he is forced to be very well convinced that 'tis all a lye.'

আধুনিক রোমান্সে মধ্যযুগীয় কাঠামো গৃহীত না হলেও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোমান্টিক কবিকল্পনার স্বপ্নতা, রোমান্টিক যন্ত্রণা, ইউটোপিয়ার স্বপ্ন, রোমান্টিক বিদ্রোহ, রোমান্টিক বিষাদ এবং সুসমঞ্জস অতিপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তি। আর দূরীভূত হয়েছে মধ্যযুগীয় মানসভাবনা, কুসংস্কার তথা অন্ধভীতি। দেশ ও কালের দূরত্বও রোমান্স সৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে রোমান্সের ধারা প্রাগাধুনিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অব্যাহত। তবে সময়ের বিবর্তনে চরিত্রের বদল ঘটেছে। মধ্যযুগীয় রোমান্সে কল্পনার বর্ণাঢ্যতা, অতিপ্রাকৃতের ব্যাপকতা, অলৌকিকতা, বীর্যবান পুরুষ, রূপবতী নারী, আদর্শায়িত প্রেমের উদ্ভাস লক্ষ্য করি। আধুনিক রোমান্সে নিছক কুহেলিকাচ্ছন্ন কল্পলোক নয়, দৈনন্দিনের বাস্তব, দুঃখ, যন্ত্রণা যুক্ত হয়েছে। ইউরোপে আখ্যানের দুটি ধারা—রোমান্স ও নভেল। বাংলায় আমরা উপন্যাস বলতে সাধারণত দুই-ই বুঝি। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' 'উপন্যাস' গোত্রভুক্ত হলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রোমান্স। কিন্তু এঁদের উপন্যাস যখন রোমান্স চিহ্নিত, তখন তা নিশ্চয়ই মধ্যযুগীয় লোককথা, গীতিকা, রূপকথা বা রোমান্সের লক্ষণযুক্ত নয়। সেখানে দেশ-কালের যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শগত পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের একাধিক উপন্যাস বিশেষত 'শেষের কবিতা', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', বুদ্ধদেব বসুর একাধিক উপন্যাসে রোমান্সের রস পাওয়া যায়। তবু রসজ্ঞ সমালোচক মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'উপন্যাসের অপসৃষ্টিকে রোমান্সের আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। মিলন-মিশ্রণ সত্ত্বেও রোমান্স ও উপন্যাসের আদর্শ পৃথক। উপন্যাস ও রোমান্সের স্বাদ স্বতন্ত্র, তাদের বিচারের মানদণ্ডও পৃথক হওয়া উচিত।… সাহিত্যে রূপভেদ ও রসভেদ অনিবার্য, সুতরাং রোমান্স লয় পাবে না বর্তমানে বা ভবিষ্যতে।'

একটি বাংলা রোমান্সের বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্স শ্রেণীর অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিককালে যখন রোমান্স লেখা হয় তখন তার মধ্যে রোমান্সের অবিমিশ্র রূপটি পাই না। সম্পূর্ণ অবাস্তব জীবন বিমুখ কাহিনীকে তো উপন্যাসও বলতে পারি না। তাই এখন লেখা হয় রোমান্সধর্মী উপন্যাস বা রোমান্টিক উপন্যাস। কপালকুণ্ডলাতে আমরা রোমান্স ও উপন্যাসের মিশ্ররূপ দেখি। এটি মধ্যযুগীয় রোমান্স নয়। আধুনিক রোমান্সধর্মী উপন্যাস। অপরদিকে বলা যায় উপন্যাসের ফ্রেমে আধুনিক রোমান্স।

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী স্থাপিত হয়েছে গ্রন্থ রচনার 'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে।' উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী আকবর বাদশাহের রাজত্বের সময়ে আরম্ভ হয়েছে। মূল কাহিনীর শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগরের অদূরে বসতিশূন্য অরণ্য প্রান্তরে। উপকাহিনীর সংঘটনস্থল আগ্রায়

মুঘল অন্তঃপুরে। সেলিম মতিবিবির উপকাহিনীতে ঐতিহাসিক রস পরিবেশিত হয়েছে। দেশগত ও কালগত দূরত্ব সৃষ্টির ফলে পটভূমির রহস্যময়তা অস্পষ্টতা ও ধূসরতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। কপালকুণ্ডলার মূল সমস্যা আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হতে পারত ; কিন্তু চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব দানের মানসে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের আশ্রয় নিয়েছেন।

'কপালকুণ্ডলা'র প্রধান কাহিনীকে দুভাগে ভাগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করি—নবকুমার-কপালকুণ্ডলার অরণ্যকাণ্ড ও সংসারকাণ্ড। একে তো কাহিনীর রোমান্টিক আবেষ্টন রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উন্মুক্ত উদাসী আকাশ, গহন অরণ্যের সূচীভেদ্য নীরবতা ও অন্ধকার, বিজনসমুদ্র তীরের মহিমার পরিচয় দিয়েছেন, পাশাপাশি নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সাক্ষাতের ঘটনা সৃষ্টি করেছে অন্য মাত্রা। 'লোকালয় হতে বহুদূরবর্তী অরণ্যে কাপালিক বন্ধনমুক্ত নবকুমার ও বনকুমারীর সাগরতীরবর্তী ক্রিয়াকলাপ আমাদের বাস্তববোধের উপর পীড়ন করে না ঠিকই কিন্তু তা প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবীর অলিতে গলিতে, অভাব ও সমস্যাসমাকীর্ণ ধূলিধূসরতা হতে অনেক দূরের। সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে আলুলায়িত কুন্তলার চারিদিকে যে রসরহস্য ঘনীভূত, বনপথে পথহারানো পথিকের নিকট সেই সুন্দরী প্রাণদাত্রীর যে অসাংসারিক অপূর্বতা, বন্ধনমোচন, পলায়ন, বিবাহ প্রভৃতির যে স্তরপরম্পরা—এই সকল বিবেচনায় নবকুমার কপালকুণ্ডলার অরণ্যকাণ্ড খাঁটি রোমান্স।' (সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র)। বস্তুত নবকুমার গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে যে অপূর্ব রমণীমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন, তার মাধুর্য ও রোমান্স আলাদা—'সেই গম্ভীরনাদী সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।' সেখানে আছে অচেনা নারী, অচেনা পরিবেশ, সুন্দর গোধূলি ও সুন্দর দেহের ষড়যন্ত্র ; ওয়ালটার পেটারের মতে রোমান্টিক অনুভূতির মধ্যেই সুন্দরের সঙ্গে অপরিচিতের মিলন ঘটে—Strangeness added to beauty. এখানে Romantic strangeness ও Romantic beauty-র ষড়যন্ত্রে নবকুমারের রোমান্টিক অনুভূতি, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাতে সৃষ্ট হয়েছে—শুধু তাঁদের নয়—পাঠকসমাজেরও—'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' এ-প্রশ্ন রোমান্টিক অভিসারে লক্ষ্যহীন অপরিচিত সৌন্দর্যের জগতে যে অগণিত পাঠকসমাজ পথ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতিও প্রশ্নটি নিক্ষিপ্ত। এই রোমান্সে যুদ্ধের অসিঝনঝনানি নেই, রক্তপাত নেই ; তাই এই রোমান্সের ধারাটি, গোত্রটি ভিন্ন।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসীকন্যা। অন্যদিকে সে নিসর্গদুহিতা। তার প্রথম আবির্ভাব নবকুমারের মনে যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল ('এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র!') উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত সেই বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশাল সাগর, বিস্তৃত সৈকত, বালিয়াড়ির স্তূপ, নির্জন অরণ্য, ভগ্ন দেবালয় ও প্রেতভূমি এর ঘটনা-স্থান। অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক, ঘোর অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মাধবী যামিনী ও ঝটিকা-মুখর নিশীথ সংকেতিত কাল। এই স্থানকালের পটভূমিতে দেখা দিয়েছে শবাসীন কাপালিক, অপরূপা কপালকুণ্ডলা, ইতিহাসকীর্তিতা চমৎকারিণী ভীমকান্ত রূপধারী ছদ্মব্রাহ্মণ, তীব্র সুরাপানে সম্বিৎহারা প্রেমিক ও আকাশমণ্ডলে দৃষ্ট করালী মূর্তি। সবই বিস্ময়জনক। আর রোমান্সের উৎস বিস্ময়রস।

কপালকুণ্ডলায় রোমান্সের নাটকীয় লক্ষণ প্রথমাবধি লক্ষণীয়। উপন্যাসটির গতি ঠিক গ্রীক ট্র্যাজেডির মত অবিসর্পিত, সবধরনের বাহুল্য-বর্জন করে অবশ্যম্ভাবী বিষাদময়

পরিণতির অভিমুখী। ঘটনার দ্রুততা, আতিশয্য, আকস্মিকতার ফলে চরিত্রের অন্তর্জগৎ এখানে অনুদঘাটিত। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার অসম্পূর্ণ ও অস্ফুট। চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ এখানে সম্ভব হয়নি। রোমান্সসুলভ চমৎকারিত্ব ও অলৌকিকত্ব এখানে লক্ষণীয়। এটা ঠিকই যে, মতিবিবি রোমান্সের চরিত্র নয়, মতিবিবি-নবকুমার সম্পর্কের আখ্যান, নবকুমার-মৃন্ময়ীর জীবনের বিপর্যয়ের কারণস্বরূপ তার ভূমিকা, সেলিমের প্রতি তার ভালোবাসার অঙ্কুরোদ্‌গম অবাস্তব নয়। তীর্থযাত্রী বৃদ্ধ বা নৌকার মাঝি, ভিখারি বা পথিক, পেশমন এবং শ্যামাসুন্দরী বাস্তব চরিত্র—relevant to real life. কিন্তু কপালকুণ্ডলা সমাজচিত্র রচনা বা সামাজিক কোনো সমস্যা প্রদর্শনের জন্য লেখা হয়নি। দ্বিতীয় বিল্বপত্রটি দেবীর পা থেকে পড়ে যাওয়া, কপালকুণ্ডলা ও কাপালিকের স্বপ্নাদেশ এবং আকাশে ভৈরবীমূর্তি দর্শন—রোমান্সের অলৌকিক রসকেই পুষ্ট করেছে।

কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণ রোমান্স নয়, কিন্তু সর্বাধিক রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত, কিয়দংশে উপন্যাস লক্ষণযুক্ত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা হল : "কপালকুণ্ডলার রোমান্টিক আবেষ্টন রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন মৃত্তিকা হইতে স্বতই উৎসারিত হইতে পারে। আমাদের শান্ত ধর্মাবিভূত জীবনের উপর যদি কখনও কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয় তবে তাহা প্রবল ধর্মোন্মাদের দিক হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এই জন্যই কপালকুণ্ডলার উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে তাহা তান্ত্রিক প্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্মপ্রাণতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে"। (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)।

নবকুমার-কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের এক জীবনজিজ্ঞাসাই প্রকট হয়েছে। কপালকুণ্ডলা যদি হয় প্রকৃতি-স্বরূপা বা প্রকৃতির প্রতিনিধি তবে নবকুমার সমাজের প্রতিনিধি। মানুষের জীবনে প্রকৃতির প্রভাব অধিকতর কার্যকর না সমাজের প্রভাব অধিকতর ক্রিয়াশীল, তাই এ উপন্যাসের জিজ্ঞাস্য। এ জিজ্ঞাসা মানবজীবনের জবানীতে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি যা রচনা করলেন তা হয়ে উঠেছে সামান্য উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত হলেও—অসাধারণ কাব্য—উৎকৃষ্ট আধুনিক রোমান্স।

রোমান্স ও নভেল

ইউরোপ গদ্য আখ্যানের দুটি ধারা—রোমান্স ও নভেল। বাংলায় একসময় আমরা বলেছি 'রমোন্যাস' ও 'উপন্যাস'। কিন্তু বাংলায় উপন্যাস বলতে দুই-ই বুঝি। উপন্যাস ও রোমান্সের প্রধান প্রভেদ 'বাস্তবগুণের আপেক্ষিক প্রাধান্য' নিয়ে। 'Novel' অবিমিশ্র ভাবে বাস্তব। রোমান্সের বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের। নভেল হল 'realistic prose fiction', অন্যদিকে রোমান্সের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'Romantic fiction', 'an extravagant fiction', 'a fictitious narrative in prose of which scenes and incidents are very remote from those of ordinary life'. সাহিত্যে রোমান্স ধারাটির জন্ম মধ্যযুগে। ডঃ কেট্‌ল-এর মতে, 'Romance was the nonrealistic aristocrat literature of feudalism.' রোমান্সের অভিসার willing suspension of disbelief-এর পথে। উপন্যাসের রূপসন্ধানী হলে দেখব, রোমান্সের বিরুদ্ধাচরণ ঘটেছে ষোড়শ শতক থেকে। পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বোকাচিও, চসার, রাবলে, সারভান্তেস, এঁদের সৃষ্টিতেই মধ্যযুগীয় রোমান্সের মায়ামদির অবিশ্বাস্য কল্পজগতের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করবার চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হল। এই মুক্তির সুরসঞ্চারী কথাশিল্পের সামগ্রিক পরিণতি ঘটে শিল্পবিপ্লবের পরে। মধ্যযুগীয় রোমান্সে কল্পনার অবাধ বিস্তার। অতিপ্রাকৃত ঘটনা সেখানে প্রশ্রয় পায়। চরিত্র অপেক্ষা ঘটনার প্রাধান্য। চরিত্রগুলি সাধারণত সমতলসদৃশ [flat character]। নভেলের জন্ম আধুনিক কালে, সেখানে কাহিনী বাস্তব অভিজ্ঞতাশ্রয়ী, ঘটনাধারা কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রেরই প্রাধান্য আর চরিত্রগুলি বহুতলবিশিষ্ট [Round character]। নভেল হল জীবনমুখী, রোমান্স জীবনবিমুখ। নভেলের জগৎ রৌদ্রালোকিত বর্তমান, রোমান্সের জগৎ সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে ঘেরা অতীত।

রোমান্স সৃষ্টিতে প্রয়োজন দেশ ও কালের দূরত্ব। এই দূরত্ব আখ্যানবস্তুকে স্বপ্নমাধুর্য ও শোভনতায় মণ্ডিত করে। এই স্বপ্নমাধুর্য রোমান্সের প্রাণ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রেখে বলা যায়, জীবনের বীরোচিত বিকাশগুলো, মনের উঁচু স্তরে বাঁধা ঝঙ্কারগুলো, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা সমারোহই, মুখ্যত রোমান্সের ভাববস্তু। রোমান্সে আমাদের সম্ভাব্যতার সীমারেখাকে বাড়িয়ে নিতে হয়। রোমান্সে ঘটনার গতি অসম্ভব দ্রুত। এখানে চরিত্রের গতি নেই, বিকাশ নেই, রোমান্সে চরিত্রের মধ্যে আদর্শ আছে, উপন্যাসের উত্তাপ নেই। উপন্যাসের তুলনায় রোমান্স বেশি পরিমাণে নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত। রোমান্সে নাটকীয় নৈর্ব্যক্তিকতা। উপন্যাসের বিষয়ানুগত্য এখানে অনুপস্থিত। ঔপন্যাসিক বস্তুনিষ্ঠ। রোমান্স রচয়িতা তা নন। জীবনের সহজ প্রবাহের বিকাশ উপন্যাসে—অস্বাভাবিক বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল গৌরবময় সমারোহ রোমান্সে। ফলে এভাবে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে, উপন্যাসকে যদি বলি 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' রোমান্স হল 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রনগুচ্ছ।'

নভেল ও রোমান্সের পার্থক্য নির্দেশ করে Clara Reeve জানিয়েছেন, 'The novel is picture of real life and manners and of the time in which it is written. The Romance, in lofty and elevated language, describes what never happened nor is likely to happen. [*Progress of Romance*.]

মধ্যযুগীয় রোমান্সের সঙ্গে আধুনিক রোমান্সের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। বাংলা উপন্যাসেও এই বাস্তবকে 'কপালকুণ্ডলা'র মতো উপন্যাসে ভিন্ন রূপে দেখি। এই উৎকৃষ্ট রোমান্সের মধ্যেই জড়িয়ে রয়েছে উপন্যাসের উপাদান। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য "মধ্যযুগীয় রোমান্স···সম্পূর্ণ বাস্তব সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাহার উপন্যাসশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্ধা ছিল না ; তাহার অন্তহীন, মায়াঘন অরণ্যানীর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিধ্বনি বড় একটা শুনা যাইত না। কিন্তু আধুনিক যুগে যে প্রবর্ধমান বাস্তব প্রবণতার মধ্যে সামাজিক উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্সের উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোনো স্থান নাই। রোমান্স লেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়, ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা] লক্ষ্য করি কপালকুণ্ডলায় বাস্তবতার দাবি সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি।

Rene' Wellek ও Austin Warren ব্যাখ্যা করেছেন : 'The Novel is realistic ; the romance is poetic or epic ; we should now call it mythic···the novel develops from the lineage of non-fictitious narrative forms—the letter, the journal, the memoir or biography, the chronicle or history ; it develops, so to speak, out of documents ; stylistically it stresses representative detail, mimesis in its narrow sense. The romance on the other hand, the continuator of the epic and the medieval romance, may neglect verisimilitude of detail (the reproduction of individuated speech in dialogue, for example), addressing itself to a higher reality, a deeper psychology.' [*Theory of Literature*]।

বঙ্কিমের রোমান্সধর্মী উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। কাহিনী এবং চরিত্র আছে বলে কপালকুণ্ডলা প্রাথমিক ভাবে উপন্যাস মনে হলেও রোমান্সের উপাদান এখানে এত বেশি যে একে উৎকৃষ্ট আধুনিক রোমান্সই বলা যায়। অতিপ্রাকৃত, ঐতিহাসিক আবহাওয়া, অলৌকিক ঘটনা কপালকুণ্ডলাকে রোমান্স রসপুষ্ট করেছে। ঐতিহাসিক বা কাব্যিক রোমান্স যেমন রোমান্সের শ্রেণীভেদে স্বীকৃত, তেমনি উপন্যাসের এখন নানা শ্রেণী—সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি।

সামাজিক উপন্যাস

যে কোনো সমালোচকই বলবেন, উপন্যাস একটি সমাজসচেতন শিল্পকর্ম। উপন্যাসের বিষয়ও মানুষ ও সমাজ। সমাজবিবিক্ত শিল্পকর্ম উপন্যাস নয়। এক অর্থে সব উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাস। শুধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, আমরা সকলেই এই অভিমত পোষণ করি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভেতরও আমরা একটা সমাজ পাই। এমনকি যাকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলি, তার ভেতরও সমাজ রূপান্তরের ইতিহাস লক্ষ্য করা কঠিন নয়। সমাজের যে কোনো দিক নিয়ে ভাবি না কেন, রাজনীতি, অর্থনীতি, আঞ্চলিক উপাদান, ইতিহাস সবই কোনো না কোনো ভাবে সমাজপ্রকরণে নিহিত। যে উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল প্রচলিত সমাজ, যেখানে চরিত্র বা ঘটনা সমাজের উপকরণমাত্র, মানবজীবনের বিশ্বস্ত চিত্রণ যেখানে শিল্পমণ্ডিত, তাই-ই সামাজিক উপন্যাস।

M. H. Abrams ব্যাখ্যা করছেন : 'The Sociological novel emphasizes the influence of social and economic conditions on characters and events ; often it also embodies an implicit or explicit thesis recommending social reform.' (*A Glossary of Literary Terms*)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, H.B. Stowe র *Uncle Tom's cabin*, Upton Sinclair-এর *The Jungle*, *John Steinbeck*-এর *The Grapes of wrath*। পাশ্চাত্য সমালোচকদের কাছে সামাজিক উপন্যাস Thesis Novel হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে। তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, সামাজিক উপন্যাস বা Thesis Novel, 'One which treats of a social, political or religions problem with a didactic and perhaps, radical purpose. It certainly sets out to call people's attention to the short comings of a society.' [*A Dictionary of Literary Terms And Literary Theory* : J. A. Cuddon]। এর অর্থ বা ব্যাখ্যা ভিন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয়, এখানেও দৃষ্টান্ত হিসেবে আপটন সিনক্লেয়ারের *The Jungle* ; H. B. Stowe'-র *Uncle Tom's Cabin* উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখিত হয়েছে, ডিকেন্সের *Hard Times*, চার্লস রীডের *Hard Cash*, অ্যালান প্যাটনের *Cry, the beloved country* ইত্যাদি।

আমরা লক্ষ্য করেছি, সমাজ ও অর্থনীতির প্রভাব, সামাজিক উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার উপর পড়ে থাকে। এবং 'জীবনের সংকট সৃষ্টি করে'। 'সামাজিক সংস্কারের প্রচ্ছন্ন আদর্শ ও কামনা এই সামাজিক উপন্যাসে থেকে যায়।' রাজনৈতিক ব্যাপার প্রাধান্য পেলেও, এই ধরনের উপন্যাসে, সমাজ পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত থাকে। 'সাহিত্যসন্দর্শন'কারও পাশ্চাত্য ভাবনা অনুযায়ী সরাসরি উল্লেখ করেছেন : 'যে উপন্যাসে সমাজের রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়বস্তুর অবতারণা থাকে, তাহাকে সামাজিক উপন্যাস কহে।' অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক বাস্তবের উপর সামাজিক বাস্তবের চাপ থাকে। পরিবার জীবন বা কোনো দুটি পরিবারের শরিকী বিরোধে সমাজবিধি যখন প্রভাবশালী ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন কাহিনীবস্তু আর নিতান্তই পারিবারিক থাকে না, তা সামাজিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তখনই তা সামাজিক উপন্যাসের চরিত্র পায়।

সামাজিক উপন্যাসের আলোচনাকালেও মনে রাখতে হবে, উপন্যাসের সঙ্গে সমাজগতির নিবিড় সম্বন্ধের কথা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন, 'সমাজচিত্র-প্রধান সামাজিক উপন্যাসে দুটি গুণগত শ্রেণী কল্পনা করা চলে ; প্রথমটিতে ঔপন্যাসিক প্রচলিত সমাজপটের প্রতিষ্ঠাভিত্তিকে আঘাত হানেন, যেমন—থ্যাকারে। দ্বিতীয়টিতে সমাজের পূর্বস্থির মূল্যগুলির ক্ষেত্রে নতুন প্রশ্নের উদ্ভবকে লেখক যাচাই করেন, যেমন—জর্জ ইলিয়ট। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহৃত কালখণ্ডের উপর বৈশিষ্ট্যের ভিতর থেকে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বরূপকে নিষ্কাশিত করে নেয়া হয়। সুতরাং লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিশিষ্টতায় রসেরও বিশিষ্টতা সম্পাদিত হয়। সামাজিক উপন্যাসে লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গির নিজস্বতায় তাঁর চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বরূপের রূপায়ণ রসগত বিশিষ্টতা লাভ করে।' (সামাজিক উপন্যাস : অলোক রায় সম্পাদিত সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য)।

বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক অর্থে সামাজিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত হলো, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (১৮৭৪), রমেশচন্দ্র দত্তের সংসার (১৮৮৬) সমাজ (১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), যোগাযোগ (১৯২৯), শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ (১৯১২), গৃহদাহ (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), শেষপ্রশ্ন (১৯৩১), তারাশঙ্করের গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহরতলি (১৯৪০), সুবোধ ঘোষের শতকিয়া (১৯৫৮)।

একটি বাংলা সামাজিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' একটি খাঁটি সামাজিক উপন্যাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সমাজ-সমালোচনামূলক উপন্যাস। 'অঙ্কনের বাস্তবতায় বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় ও সহানুভূতির গাঢ়তায় ইহা অনুরূপ বিষয়ের সমস্ত উপন্যাস হইতে বহু উচ্চে স্থান গ্রহণ করিয়াছে।' (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। পল্লীসমাজে ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা চিত্রিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ সমাজ বাস্তবের চিত্র। পারিবারিক বাস্তবের উপর সমাজবাস্তবের অভিঘাতও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সমস্যা, বিরোধ, সংকট, পারিবারিক বৈষয়িক কলহ, স্বার্থপরতা, হীন চক্রান্ত, দলাদলি এখানে উঠে এসেছে, দুটি নরনারীর হৃদয়ঘটিত সমস্যা উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেলেও সমাজ শাসনের চাপে তার যথার্থ পরিণতি ঘটতে পারেনি।

প্রাথমিক ভাবে উপন্যাসে বিরোধ দুই পরিবারে, দুটি শরিকের। বলরাম মুখুজ্যে ও বলরাম ঘোষাল বিক্রমপুর থেকে এদেশে কুঁয়াপুর গ্রামে আসেন, কুলীন ও বুদ্ধিমান মুখুজ্যে প্রভূত বিষয় সম্পত্তি করেন, ঘোষালের বিবাহকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর মনোমালিন্য চরম আকার নেয়, সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কিন্তু মুখুজ্যের মৃত্যুর পর জানা যায়, নিজের পুত্র ও বন্ধু ঘোষালের পুত্রকে মুখুজ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে গেছেন। যখনকার কাহিনী পল্লীসমাজ, তখন ঘোষাল বংশের বড় তরফ ও ছোট তরফের মধ্যে মুখ দেখাদেখি দশ বছর ধরে বন্ধ ছিল। তারিণীর মৃত্যুতে বড় তরফের বেণী খুশি হয়। সূত্র অনুযায়ী বেণীর জ্ঞাতিশত্রু রমেশ। রমেশ পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতে গ্রামে ফিরে এলে বেণী ঘোষাল তার দলবল নিয়ে পণ্ড করে দিতে চায় অনুষ্ঠান, ঘোঁট পাকায় রমেশের বিরুদ্ধে। 'রমেশের বাবার শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে যে ছবি শরৎচন্দ্র আঁকেন তা জাতিধর্ম অভিমানী ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ মধ্যশ্রেণীর ছবি : তোষামোদ, সঙ্কীর্ণতায়, কুৎসিত কলহে এই সমাজ যে মৃত্যুপথযাত্রী, এরা যে সামাজিক ভূমিকাহারা, একথা অবশ্যই শরৎচন্দ্র বুঝিয়ে দেন। গ্রামীণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের লোভ ও করুণ আত্মমর্যাদাহীনতায় শরৎচন্দ্র কোন ট্র্যাজেডি দেখেননি, দেখেছেন বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় করুণ

আত্মসমর্পণ। দেখেছেন অনুধাবনীয় এক শ্রেণীর খেয়োখেয়ি। দারিদ্র্যে শ্রেণীগত তাৎপর্য-হীনতায় জাতিবর্ণের অভিমানী এরা শ্রাদ্ধের দিনটিকে করে তুলেছে কুৎসিত জগৎ।' [পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস রাজনৈতিক/শরৎচন্দ্র]।

গ্রামের মানুষজনের জীবনধারা গ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকায় সমাজ শাসনের চাপ ছিল বড় বেশি, উপেক্ষা করবার সাহস কারো ছিল না। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার যেমন সমাজপতি ছিল, পরান্নজীবী হয়েও শাসকশ্রেণীভুক্ত ছিল ধর্মদাস, দীনু ভট্টাচার্য, বাঁড়ুয্যে মশাই-এর মতো ব্রাহ্মণ শ্রেণী। সামাজিক উপন্যাসে রাজনীতি যেমন আসে, অর্থনীতির ছবিও থাকে। ধর্মদাসের আত্মীয়তার আতিশয্য, দীনুর অপরিমিত লোভ, বাঁড়ুয্যে মশাই-এর তঞ্চকতাকৌশল—এসবের মূলে দারিদ্র্য, প্রচণ্ড দারিদ্র্য। পল্লীসমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যেও এই দারিদ্র্য। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। অর্থনীতির ফাঁদে ছটফট করতে করতে ধর্মদাস, দীনু, বাঁড়ুয্যে মশাই উঞ্ছবৃত্তি করে, আর গ্রামের 'ছোটলোক' চাষাসম্প্রদায়, গরিব সাধারণেরা অকৃতজ্ঞ হতে পারে না। তাই প্রথম পক্ষ যখন সমাজপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতারণা করে, দ্বিতীয়পক্ষ রমেশকে শত্রু ভাবে না, এদের 'একতা ও ধর্মজ্ঞান' নষ্ট হয় না।

রমেশ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামে ফিরে এলেও তার গ্রামসম্পর্কে রোমান্টিক স্বপ্ন অনতিবিলম্বেই ভেঙে যায়। তার স্বপ্ন ছিল, গ্রামের মানুষের কল্যাণ করবে, জনহিতসাধনে কর্মসূচী নেবে, তা রূপায়ণ করবে। কিন্তু বেণী ঘোষালদের ষড়যন্ত্রে সবই পণ্ড হয়ে যায়। তাকে জেলে যেতে হয়। গ্রামীণ সমাজের মূঢ়তা ও অশিক্ষাকে দায়ী বলে মনে করেন তার জ্যাঠাইমা, বেণীর মা বিশ্বেশ্বরী। উপন্যাসে বিশ্বেশ্বরী বেণীর বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিতে না পারলে বা নিয়ন্ত্রক ভূমিকা না নিতে পারলেও চিন্তনে-পরামর্শ দেওয়ায় অনেকটা বিবেকের মতো ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর কাশী যাবার কারণ, বেণীর মতো পাষণ্ড যাতে তাঁর মুখে আগুন দিতে না পারে। সেই বিশ্বেশ্বরীর কাছে রমেশ দুঃখের কথা, জাতবর্ণের কথা বলতে গেলে, বিশ্বেশ্বরী বলেছেন, 'আলো জ্বেলে দে রে, শুধু আলো জ্বেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল ; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা ; তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোনটা কালো কোনটা ধলো।' শরৎচন্দ্র এই সামাজিক উপন্যাসে সমাজসমস্যার মূলীভূত কারণ খুঁজেছেন বিশ্বেশ্বরীর উক্তির মধ্য দিয়ে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের, এমনকি গোবিন্দ গাঙ্গুলী ধর্মদাসেদের কলহে ব্যথিত ও হতাশগ্রস্ত রমেশকে বিশ্বেশ্বরী বুঝিয়েছেন, 'এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে।' এদের চারিত্রিক মনস্তত্ত্ব, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে একটি মানবিক আবেদনের সুর শুনিয়ে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই শ্রেণীর সম্বন্ধ নিরূপণ করেছেন লেখক যা সামাজিক উপন্যাসের লক্ষণ।

উপন্যাসে রমা-রমেশের জটিল মনস্তত্ত্ব ও কার্যকারণ উল্লিখিত হয়েছে ঘটনাসমূহের প্রেক্ষিতে। কিন্তু প্রেক্ষাপট সমাজ। সমাজ শাসনের চাপ রমা-রমেশকে মিলিত হতে দেয়নি। সেখানে রমার ভেতরকার সংস্কারও যে ক্রিয়াশীল ছিল না তা নয়। রমার মনের জটিলতাও কম ছিল না। শরিকী বিরোধে রমা ও বেণী একপক্ষভুক্ত হয়ে রমেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারকেশ্বরে যে রমা পরিচর্যা করেছে, যে রমা তার বাল্যসহচরী ছিল, যার প্রতি তার ভালোবাসা আজো অটুট সে রমা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, লাঠিয়াল পাঠিয়েছে রমেশকে প্রতিরোধ করতে, জেলে পাঠিয়েছে তারই মিথ্যা সাক্ষ্যে। রমার আত্মীয়স্বজন বিরোধ করতে পারে, দুর্ব্যবহার করতে পারে কিন্তু রমা কেন? রমাও যে তাকে গভীর ভাবে ভালোবেসেছে,

উপন্যাসে তার ইঙ্গিত মেলে, কিন্তু সমাজকে সে জানাতে চায়নি, বেণী ঘোষালদের মতো কুচক্রী পাষণ্ডের ভয়ে। তবু শেষ রক্ষা হয়নি, বেণীদের পক্ষ থেকে অপবাদ নিতে হয়েছে। অনেক সময়ই রমেশের প্রতি রমার আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। সমালোচক বলবেন, রমার এই বৈষয়িক ও সমাজ অনুগত সত্তা তার বাহ্যিক সত্তা মাত্র। তার ভেতরকার সত্তা রমেশমুখী, রমেশকেন্দ্রিক, রমেশের প্রেমে স্থিত। বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করেও মনোজগতে রমেশের জন্য লালিত ভালোবাসার উত্তাপে নিজে শান্তি পেতে চেয়েছে। রমেশের প্রতি তার অধিকার ছিল বলেই ভৈরব আচার্যের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে রমেশের ক্রোধ থেকে বাঁচাতে তার হাত চেপে ধরেছে, ফলে গ্রামের সব নিন্দা, অপযশ মাথায় নিয়ে তার প্রায়শ্চিত্তের পথ বেছে নিতে দূর তীর্থস্নানের অভিমুখে যাত্রা করেছে। বিশ্বেশ্বরীর কাছে রমা বলেছে, 'আমি যখন আর থাকব না, তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমিও পেয়েছি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।' সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'রমা কি পল্লীসমাজকে জানে? সেই সমাজ তার মনের মধ্যে কি কোনো দ্বন্দ্ব সৃজন করেছিল, না, সে শুধু সে-সমাজকে মানে। সে শুধু অখণ্ড জীবনের দাসী মাত্র। এ অবস্থায় রমেশকে দেখামাত্রই যখন তার প্রেমের বোধে জোয়ার এল তখন থেকেই তার মনের মধ্যে শুরু হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বন্দ্ব।' [বাংলা উপন্যাসের কালান্তর]। কিন্তু তিনি আরও গভীরে গিয়ে মৌলিক কথা বলতে চেয়েছেন, 'রমার মনের মধ্যে যদি সমাজ প্রদত্ত সংস্কারগুলির জট দৃঢ়বদ্ধ না থাকে তাহলে বাইরের দিক থেকে বেণী ঘোষাল বা তারিণীর মূল্য কতটুকু? আর তার সমাজসত্তা এবং ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বেরই বা করুণ অর্থগৌরব কোথায়? যদি এমন হয় যে রমা জানে যে সমাজপ্রদত্ত সংস্কারগুলির বাস্তবিক কোনো অর্থ নেই, অথচ সেই সমাজের মুখে তাকিয়েই তাকে মনে মনে রমেশের পক্ষাবলম্বন করতে হচ্ছে এবং সামাজিক ভাবে রমেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে তা হলে সেক্ষেত্রে রমার বেদনারই বা মূল্য কতটুকু ; আর রমার ব্যক্তিস্বরূপের মূল্যই বা কী, সেই কারণেই শেষ অধ্যায়ে রমার কাশীবাস বড়োজোর আমাদের করুণার্দ্র সহানুভূতির উদ্রেক করে, আর কিছু নয়।' অজিতকুমার ঘোষ অবশ্য স্বতন্ত্র অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ভিন্ন প্রেক্ষিতে, 'রমা ও রমেশের ভালোবাসার ব্যর্থতা দেখাইয়া তিনি পাঠকের মনে যে বেদনা ও সমাজের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতেই তাঁর শিল্প সমাজ বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।' [শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার]।

'পল্লীসমাজ' নামের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র কাহিনী সূত্রে বাংলার পল্লীসমাজকেই ধরতে চেয়েছিলেন। পরিবার জীবনে, শরিকী বিরোধে এই উপন্যাস সমাজ বিধির প্রভাবশালী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, রমা-রমেশের বিরোধে ও সম্পর্কে যুক্ত হয়ে গেছে সমাজবিধি, রমেশের কল্যাণমূলক কাজে বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে বিরোধী শরিক ও সমাজপ্রধান বেণী ঘোষাল, এমনকি রমাও ; গ্রামীণ অর্থনীতির চাপ নিতে গিয়ে কি ভাবে মানব চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে, হিন্দুমুসলমান ঐক্যে, রমেশের প্রেরণায়, তার অনুপস্থিতিতে, গ্রামে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে, যাতে রমাও, যে কিনা বিপক্ষ শরিক, উদ্ভাসিত হয়েছে—সব মিলিয়ে সামাজিক উপন্যাসের শিলমোহর চিহ্নিত হয়েছে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন অভিমত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সকলেই একমত যে, ইতিহাসের কাহিনী বর্তমান বা সমকালের কাহিনী নয়। যা পূর্বে সংঘটিত তাই ইতিহাস। অতএব লেখক এই ধরনের উপন্যাস লিখতে গেলে অতীতাশ্রয়ী হবেন, সন্ধিৎসু মনের অধিকারী হবেন, তথ্যনিষ্ঠ হবেন। উপন্যাসে কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ সব সময় অবাঞ্ছিত নয়। যে ঘটনা ঘটেছিল তাই ইতিহাস এবং যে ঘটনা ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত অর্থাৎ যা পরিকল্পিত তাই উপন্যাস। আর এই দুয়ের সমীকরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস। এইভাবে মোটা দাগের আলোচনা মেনে নিলেও বলতে হবে ইতিহাসের বাস্তব ও উপন্যাসের বাস্তব একরকম নয়। সেখানেও ঐতিহাসিক উপন্যাসরচয়িতার দুরূহ দায়িত্বের প্রশ্ন এসে যায়। অতীতকাল আশ্রয় হলেও, লেখকের দায়িত্ব হবে ইতিহাসের ঘটনাকে পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলা, বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। ইতিহাসের বাস্তবকে প্রসারিত করে সমৃদ্ধ করে তুলবে উপন্যাসের বাস্তব, এখানেও রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। স্কটের ওয়েভার্লি নভেল আলোচনা সূত্রে কার্লাইল বোঝাতে চেয়েছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ শুধু অতীত জগতের কাহিনী রচনা করে না, শুধু তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ বা ঐতিহাসিক বিতর্ক সেখানে বড় কথা নয়—রক্তমাংসের মানুষকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করাই স্কটের মতো ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।

আমরা এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে দুটি অভিমত উল্লেখ করতে চাই—প্রথমত, 'The historical novel takes its setting and some of its characters and events from history ; the term is usually applied only if the historical milieu and events are farely elaborately developed, and important to the central narrative' [*A Glossary of Literary Terms* : M. H. Abrams], এই সূত্রে স্কটের *Ivan Hoe* ডিকেন্সের *A Tale of Two Cities* ও কেনেথ রবার্টস-এর *North-west Passage* উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে বোঝানো হয়েছে : 'A term which refers to novels set in a period of time recognizably 'historical' in relation to the time of writing. The past tense may be employed in the narration, the account may purport to have been written in that past time or in some intervening time. The subjectmatter of the historical novels tends to encompass both public and private events, and the protagonist may be either an actual figure from the past or an invented figure whose destiny is involved with actnal events.' [*A Dictionary of Modern critical Terms* ; Edited by Roger Fowler]।

বস্তুত, 'ইতিহাসের 'বিশাল সংগঠনের ছায়াতলে,' পারিবারিক জীবনের ছবি আঁকা খুবই কঠিন, ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনের সংযোগ সাধনের অনিবার্যতা বুঝে নেওয়াও অনেক সময় সহজ হয় না, অথচ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই ধরনের উপন্যাসের 'আকাশ বাতাসের মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্য' রক্ষা জরুরি, এরকম কথাই বুঝিয়েছেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে পড়বে, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন অংশে তাঁর অভিমত ছিল : "ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসে লেখক সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।'' কিন্তু অতীত যুগের সমাজ-জীবনে, মানবজীবনযাত্রা তাঁর লেখায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে হবেই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সত্যের জন্য ইতিহাস পড়তে, আনন্দের জন্য আইভ্যান হো পড়তে। 'কাব্যে যদি ভুল লিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।' এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জটিল নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতাংশটির কথা মনে পড়বে, ''সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি/রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' ('ভাষা ও ছন্দ')। তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের সত্য বা বাস্তব সত্য বা বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের বা উপন্যাসের সত্য নির্বিশেষ বা নিত্য সত্যের মেলবন্ধন চাই। এই কাজ সহজ নয়। যিনি প্রকৃত প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক, তিনিই পারবেন এই কাজ সম্পন্ন করতে। এক্ষেত্রে সুকুমার সেনের ব্যাখ্যাও আমাদের সাহায্য করবে, তিনি ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের পার্থক্য নিরূপণ করে জানিয়েছেন, প্রথমটি 'তথ্যসর্বস্ব' দ্বিতীয়টি 'অংশত তথ্যনির্ভর এবং অংশত কল্পনানিষ্ঠ'। প্রথমটিতে কল্পনার স্থান নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে। 'তথ্যসম্ভারের ঊনতা' কল্পনা দিয়ে পূরণ করা যায়। কিন্তু সুকুমার সেন গল্পরসকে স্পেস-টাইম-কনটেকসট-এর আধারে পরিবেশনের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে কাহিনীর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সমালোচক বলবেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অতীত যুগের সৌন্দর্য সন্ধান। এদিক থেকে এই ধরনের উপন্যাসকে বলা যায় রোমান্টিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস যেহেতু ইতিহাস নয়, রোমান্সের পরিবেশের ঘনত্ব লক্ষিত হলে রোমান্সের অবাস্তবতাও উঁকি দিতে পারে, যা আধুনিককালে রচিত হলেও সেখানে পরিমাণগত ভাবে রোমান্সের প্রাচুর্য ও অবাস্তবতা ক্ষীয়মাণ মনে হবে। সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার প্রাধান্য লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনাই প্রাধান্য পাবে না, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের দাবিও কম নয়। অনৈতিহাসিক চরিত্রের অবস্থান ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনিবার্য। তবে যেহেতু চরিত্রে অনৈতিহাসিক রূপের কথা বলছি, তাকে অবশ্যই ইতিহাসের কালের প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। অনেকক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপন্যাসে কালানৌচিত্য দোষ বা কালবিরোধ দোষ (Anachronism) ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে সচেতন হতে হবে অতীত জীবনেতিহাস, রীতিনীতি, আচারআচরণ, সংস্কার, বিধিনিষেধ, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনপ্রণালী সম্পর্কে। প্রমথনাথ বিশী ব্যাখ্যা করেছেন, "একশ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ পর্বের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নায়ক করিয়া গল্প রচনা করা যাইতে পারে, আবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অন্তরালে বা গৌণ রাখিয়া কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াও গল্প রচনা করা চলে, তবে দেখিতে হইবে যে, গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট পর্বের সত্য ইতিহাসের সীমানাকে অতিক্রম করিয়া না যায়।" ('রমেশচন্দ্র দত্ত' : বাংলার লেখক)। স্কট তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে এই দুই দাবি রক্ষা করেছেন জানিয়ে প্রমথনাথ মন্তব্য করেছেন : ''ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট পর্বের সাধারণ ব্যক্তিদের চরিত্র দুটিতেই তিনি ইতিহাসের দাবি রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণে লেখক অনেকটা হাতপা-বাঁধা, কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।''

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তানুযায়ী, 'সাহিত্য' গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা বলেছেন, তা হলো ইতিহাসের রস। তাঁর বক্তব্য, 'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই।'' ('ঐতিহাসিক উপন্যাস')। মোট কথা 'লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।' রবীন্দ্রনাথ যাকে ঐতিহাসিক রস বলেছেন তাকেই আবার 'মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ' বলেছেন। এদিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেও বলা যাবে, ঐতিহাসিক উপন্যাসও Epic Novel বা মহাকাব্যোপম উপন্যাস। একালের সমালোচক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'আজকের ঐতিহাসিক উপন্যাসকে নামান্তরে 'বিশ্বমনা সামাজিক উপন্যাস' রূপে দেখতে চেয়েছেন ; তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, "টম জোনস্ থেকে স্পার্টাকাস ; দুর্গেশনন্দিনী থেকে উপনিবেশ পদসঞ্চার—কি অপরূপ যুগনত বিশ্বস্ততার ইতিহাস।'' (ঐতিহাসিক উপন্যাস/সরোজ দত্ত, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য/অলোক রায় সম্পাদিত)।

কোনো কোনো সমালোচক ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীবিভাজনও করেছেন। 'সাহিত্য সন্দর্শন'কারও উল্লেখ করেছেন। চিত্রটা এরকম—



হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' নিশ্চয়ই আধুনিক কালের অবিতর্কিত, বলা উচিত, বিতর্কাতীত সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস প্রচুর লিখেছেন—দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), এমনকি আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ

ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' (১৮৮২)। রমেশচন্দ্র লিখেছেন চারটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), মোগল সাম্রাজ্যের একশ বছরের ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস চতুষ্টয়ের শেষোক্ত দুটিই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে লিখেছেন বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৭) তারাশঙ্করের গন্নাবেগম (১৯৪৬), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুঙ্গভদ্রার তীরে (১৩৭২) ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ উপন্যাস।

একটি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'-এর 'চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে' জানিয়েছিলেন, 'আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'

বঙ্কিমের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি ধারণা ছিল। তিনি জানতেন বিদেশী, হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায়, দৃষ্টিতে, তথ্যে ও ঘটনা বিবরণে বিশেষ পার্থক্য আছে। ফলে এই উপন্যাস রচনা কালে, সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে, উপন্যাসের উপযোগী উপাদানগুলি তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে। হিন্দুর বাহুবল তাঁর প্রতিপাদ্য থাকায় অপ্রতিরোধ্য মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রতিস্পর্ধী চরিত্র রূপে রাজসিংহকে উপস্থাপন করতে হয়েছে। রাজসিংহ'র বীরত্ব, সাহসিকতা, ব্যক্তিত্ব ইতিহাস স্বীকৃত। হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদ্য হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এও প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন, 'অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে হিন্দু হৌক মুসলমান হৌক সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট।' একমাত্র হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদ্য বিষয় হলে অন্য ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করলেও চলত। বাহুবলের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ স্থাপনও তাঁর অন্বিষ্ট ছিল বলেই তিনি ঔরঙ্গজেব চরিত্র বেছে নিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'স্থূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব রাজসিংহ জেবউন্নিসা উদিপুরী ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যেসকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।' তথ্য ও কল্পনার সন্নিবেশে, ইতিহাস ও উপন্যাসের সুকৌশল শিল্পবন্ধনে গঠনগত সংহতিতে রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েছে। উপন্যাসে প্রকৃত ঘটনা ও কল্পিত কাহিনীর সামঞ্জস্য এমনই নিখুঁত যে ইতিহাস কখন উপন্যাসের ফ্রেমে আশ্রয় নিয়েছে তা বিচার করবার সুযোগ থাকে না।

রাজসিংহ উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র—ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহ। চঞ্চলকুমারীকে [আসল নাম চারুমতী] কেন্দ্র করে উভয়ের বিরোধ, ঐতিহাসিক ঘটনা। ঔরঙ্গজেব চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করতে চেয়েছেন, চঞ্চলকুমারীর অনীহা. রাজসিংহের কাছে চিঠি পাঠানো এবং রাজসিংহ কর্তৃক চঞ্চলকুমারীকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া, বিবাহ করা এই সব ঘটনার কাঠামো ইতিহাসসম্মত। উপন্যাসের প্রধান বিরোধের ঘটনা, রাজসিংহ ঔরঙ্গ-

জেবের, রাজপুত ও মোগলের বিবাদ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিকে ঔরঙ্গজেবের রাজপুত শক্তি সম্পর্কিত নীতি, হিন্দুবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, চরম রক্ষণশীলতা, মেবারের উপর জিজিয়া কর আরোপ অপরদিকে রাজপুত জাতির প্রতিবাদী চরিত্র, রাজসিংহ'র নেতৃত্বে প্রবল স্বাধীনতাচেতনা উভয়পক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ লড়াই-এর জন্ম দিল। 'কিন্তু কোন ব্যক্তিক অনুভূতি হৃদয়লোকের কোন উদ্বেলতা-এর মধ্যে কার্যকারণ সূত্র রচনা না করলে ইতিহাসের ঘটনা উপন্যাসের কাহিনী হয়ে ওঠে না। ঔরঙ্গজেবের সৈন্যসজ্জা, রাজসিংহের যুদ্ধনীতি এবং ফলাফল ঘটনামাত্র, কাহিনী নয়। হৃদয়রসের যোগ ঘটলেই এ ঘটনা কাহিনী হয়ে উঠতে পারে। চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেব ব্যবহার করেছেন।'

রাজসিংহ উপন্যাসে 'ঘটনাবিন্যাস ও ঘটনাবলীর অতিশয় দ্রুতি' লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি ব্যাপার যেন পূর্ব পরিকল্পিত হওয়ায় শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়েছে। অনাবশ্যক ঘটনার ভার নেই। সমালোচক বলেছেন, 'উপন্যাসের যে প্রধান লক্ষ্য বাস্তব চরিত্র চিত্রণ রাজসিংহ উপন্যাসে লেখকের তাহা উদ্দেশ্য নহে। বরং উপন্যাসের মধ্য দিয়া ইতিহাসের সত্য প্রতিফলিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া পূর্বাপর চিত্তচমৎকারী ঘটনা সংস্থানের দিকে তাঁহার লক্ষ্য রহিয়াছে। চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ হইয়াছে দক্ষ ঔপন্যাসিকের রচনাগুণে।' [অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত]। রাজসিংহ এই উপন্যাসের নায়ক হলেও প্রধান চরিত্র ঔরঙ্গজেব। অপরিমেয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী, বিবেকহীন মোগল সম্রাট, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী ধর্মহীন, অত্যাচারী ঔরঙ্গজেব নিজেই তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের বীজ রোপণ করে যান। 'এই উপাদান লইয়া কারবার করা এত কঠিন যে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ঔপন্যাসিকও সর্বদা সত্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।' টডের তথ্য হাতে থাকলেও, কাহিনীর কাঠামো তাঁর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হলেও চঞ্চলকুমারীর চরিত্রকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে বঙ্কিমকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। চঞ্চলকুমারী চরিত্রের গুরুত্ব এখানে সে এই উপন্যাসের প্রধান ইতিহাসসম্মত রাজনৈতিক সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত। চঞ্চলকুমারী নারীধর্মকে বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, বিধর্মীর করতলগত হওয়ার তুলনায় মৃত্যুকে শ্রেয় বিবেচনা করেছেন। ঠিক বিপরীতে উদিপুরী দারাশিকোর খ্রিস্টান পত্নী হওয়া সত্ত্বেও দারার মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেবের শয্যাসঙ্গিনী হতে বাধেনি। উদিপুরীর প্রতিতুলনায় চঞ্চলকুমারীর আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এই চরিত্রের কাহিনী ইতিহাসের কাঠামোকে 'মেদমজ্জা দিয়ে প্রাণবন্ত করেছে'। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ছিল, 'রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হন। উদিপুরী ও চঞ্চল কুমারীর তুলনায়, জেবউন্নিসা ও নির্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এজন্য এ সকল কল্পনা।'

রাজসিংহ উপন্যাসে রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী-ঔরঙ্গজেব যেমন প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মুখ্য দৃষ্টান্ত, তেমনি জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়া উপন্যাসের সব চেয়ে উজ্জ্বল, বর্ণময় অংশ—নিটোল, পরিণত উপকাহিনী। রক্তমাংসে গঠিত জেবউন্নিসা, জেবউন্নিসা-মবারক সম্পর্ক, উভয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দরিয়ার উপস্থিতিগত জটিলতা, উপন্যাসকে প্রাণময়, গতিবেগসম্পন্ন করেছে। মোহিতলাল মজুমদার ভেবেছেন জেবউন্নিসা কাহিনী উপন্যাসের অভিপ্রেত কাহিনী অংশ। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, জেবউন্নিসা উপন্যাস অংশের নায়িকা। বিপুল ঐশ্বর্য, সীমাহীন ক্ষমতার ও বিলাসিতার মধ্যে থেকে জেবউন্নিসা হৃদয়কে গুরুত্ব দেননি, প্রেমের তাৎপর্য ও মহিমা বোঝেননি। তাঁর প্রতি প্রেমমুগ্ধ মবারককে

তিনি প্রেমিকের মর্যাদা না দিয়ে অত্যাচার, লাঞ্ছনা, পীড়ন করেছেন। কিন্তু টের পাননি কখন তাঁর অন্তরে প্রেমের উন্মেষ হল। একদিন মবারককে কাম পিপাসা চরিতার্থ করার ঈপ্সিত পুরুষ ভেবেছেন, পরে তাঁরই ভেতর সঞ্চারিত হয়েছে মবারককে কেন্দ্র করে হৃদয়ের আকৃতি। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে মবারক যে বেঁচে থাকতে পারে না, দুইশতী মনসবদার ঐশ্বর্যবান হওয়ার সুযোগ পেয়েও, জেবউন্নিসার দম্ভ ও অহমিকা তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যথার্থ বিধান মনে করে। মবারকের সঙ্গে মিলিত হতে না পেরে জেবউন্নিসার যাপিত জীবন বিরহে বিধুর হয়ে যায়। ঔরঙ্গজেবকে যে-মবারক পর্বতরন্ধ্রে বন্দী করবার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, সেই তার সঙ্গে মিলনে চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মাণিকলালের উদ্যোগ ছিল, রাজপুত-মোগলের যুদ্ধের পটভূমিকায়, জেবউন্নিসা-মবারকের সম্পর্কের বিন্যাসে মবারকের মৃত্যু, উপন্যাসের এই উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীকে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করায় রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ জেবউন্নিসা চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই সম্পর্কের বিন্যাস, দেশ-কাল-কেন্দ্রিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর একদিকে সর্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে।' [রাজসিংহ, সাহিত্য] মবারক-জেবউন্নিসার প্রণয় কাহিনী প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'ইতিহাস এখানে মানবহৃদয় বিশ্লেষণকে অভিভূত না করিয়া তাহার অনুবর্তী হইয়াছে।' [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]। জেবউন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও ইতিহাসের সীমারেখা অতিক্রম করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে চমৎকার ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নির্মলকুমারী-মাণিকলাল কাল্পনিক চরিত্র। মাণিকলালের দস্যুবৃত্তি, পানওয়ালী-মাণিকলালের ষড়যন্ত্র, নির্মল-মাণিক বিবাহ, নির্মল ঔরঙ্গজেব—এপিসোডগুলি উপন্যাসের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। যোধপুরী বেগম, দরিয়াও একই ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে স্বাভাবিক সূত্রেই এসেছে, গৌণ চরিত্র হয়েও 'ইতিহাসযুগে'র পরিপ্রেক্ষিত রচনায় সহায়তা করেছে। সমালোচকেরা স্বীকার করেন, জ্যামিতির সরলরেখা অনুসারে উপন্যাস গড়ে ওঠে না। ঔপন্যাসিক যান্ত্রিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকতে চান না। ফলে রাজসিংহ'র চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃতি অনুযায়ী, ঔরঙ্গজেব ও অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রে গ্রহণযোগ্য অনৈতিহাসিক উপাদান যুক্ত করেছেন এবং অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক পরিবেশের উপযোগী করে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, রাজসিংহ উপন্যাসের 'ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে,' অবিশ্বাস্য গতিবেগে, বিরামহীন দ্রুততায় ; এর ফলে যাবতীয় চরিত্রের আচার-আচারণ 'সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার সীমানায় নিয়ে ফেলেছে।' রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে।' ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসে Anachronism বা কালানৌচিত্যদোষ লক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'ঐতিহাসিক রস'ও এই উপন্যাসে দুর্লভ নয়। সামগ্রিক বিচারে এটি একটি খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মহাকাব্যোপম-উপন্যাস

উপন্যাস মহাকাব্য নয়, মহাকাব্যোপম হতে পারে। মহাকাব্যের যুগ ও উপন্যাসের যুগ এক নয়। কবিতা, মহাকাব্য অথবা নাটকের তুলনায় উপন্যাস অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। র‍্যালফ ফক্স উপন্যাসকে বলেছেন 'সমগ্র মানবজীবনের গদ্য' : 'The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt take the whole man and give him expression'. [*The Novel and The People*]। যেসব উপন্যাসে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন দেশকালের ব্যাপ্তি সহ বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে শিল্পরূপ লাভ করে, তাকে বলা যায় সমগ্র মানবজীবন। এই সব উপন্যাসকেই মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় মহাকাব্যোপম উপন্যাস বা epic novel. যেমন, ফিল্ডিং-এর টম জোন্‌স, জোনাথান ওয়াইল্ড, অন্নদাশংকর রায়ের সত্যাসত্য।

মহাকাব্যের জাতকপত্র রচয়িতা সম্পর্কে আমরা জেনেছি, 'সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন—ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়ছায়া দান করিয়াছে।' মহাকাব্য রচয়িতার প্রবণতাই হলো, কাহিনী ও চরিত্রকে magnify করা. সেক্ষেত্রে আকৃতি নয়, প্রকৃতিগত বিশালতাই এর ভিত্তি। উপন্যাসের বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে দেবীপদ ভট্টাচার্য, ফিল্ডিং-এর উপন্যাসের চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন, 'একটি বিশ্বাস্য কাহিনী পরিচিত নরনারী, সমাজের বাস্তব সমস্যা, এবং মানুষের হৃদয়-বেদনা যখন একটি সুগঠন লাভ করে তখনই আমরা বলি উপন্যাস। ফিলডিং-এর হাতে এই শিল্পরূপের প্রতিষ্ঠা। মহাকাব্য সম্পর্কে বলা যায়, মহাকাব্য প্রাচীনকালের বহুজনমিলিত মৌখিক কাব্য, পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক বীরচরিত্রই যার আশ্রয়। আর উপন্যাস নাগরিক সমাজের, গদ্যের, মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি। মর্ত্যের বাস্তব, পরিচিত এবং সাধারণ হয়েও অ-সাধারণ যে-নরনারী তারাই তার আশ্রয়। তাই ফিলডিং-এর the comic epic in prose রীতিকে স্বাগত জানাতে হয়। হেগেল আধুনিক কালের নবসৃষ্টি উপন্যাসের মধ্যে এপিকের বা মহাকাব্যের রূপকেই দেখেছিলেন।' [উপন্যাসের কথা]। ক্লাসিক সাহিত্য ও সমকালীন বাস্তবতা উভয়ই এই লেখকের মন ধারণ করেছিল। 'আঠারোর শতকের ইতিহাসবোধ, ব্যঙ্গধর্মিতা নীতিবোধ ও শিক্ষাদান—সবই তাঁর মধ্যে ছিল। তারই ফলে তিনি টম জোন্‌স-এর ইতিহাস বা আখ্যান রচনা করতে গিয়ে এপিকের মতোই সমকালীন সমাজ ও মানুষের দিগন্তবিস্তৃত বিচিত্র চিত্রলিপি অঙ্কন করলেন। সমাজ ও নরনারীর এই ব্যাপক চিত্রায়ণ মহাকাব্যের ভূমিকা বৈকি।' বোঝা গেল, উপন্যাস মহাকাব্য না হলেও, দূরকালের দূরত্ব থাকলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, গদ্যের ফর্মে মহাকাব্যের স্বরূপলক্ষণ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে ; এই জন্য সে epic বা মহাকাব্য নয় : epic novel বা মহাকাব্যোপম উপন্যাস। টলস্টয়ের '*War and Peace*'-এর মধ্যে মহাকাব্যের লক্ষণ বোঝাতে গিয়ে ষ্ট্রাখভ বুঝিয়েছেন : 'A complete picture of human life. A complete picture of the Russia of that day. A complete picture of what may be called the history and struggle of people. A complete picture of everything in which people find their happiness and

greatness, their grief and humiliation. That is War and Peace.' মহাকাব্যোপম উপন্যাস, সমাজরূপান্তরের সঙ্গে কালান্তরে বদলে যায়, আধুনিক যুগে তা হয়ে যায় একেবারে লোকায়ত জীবনের আলেখ্য। যেমন গোরা, শ্রীকান্ত, গণদেবতা [চণ্ডীমণ্ডপ-পঞ্চগ্রাম]। আবার, মহাকাব্যের রসপুষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ।

একালের সমালোচক বলছেন : 'The novel deals with the individual, it is the epic of the gigantic struggle of the individual against society, against nature and novel could only develop in a society where man was at war with his fellows or nature.' [Sisir Chatterjee, *The Novel as the Modern Epic*] । বিশশতকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্ব, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হবার ফলে উপন্যাসের পরিধি বেড়েছে ব্যাপক ভাবে। দেশ-কালের রূপান্তর, সমাজ দ্বন্দ্বগুলির চরিত্র, বিশ শতকের গোড়ার দশক থেকে মানব চরিত্রের পরিবর্তন উপন্যাসের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছে। জাতীয় জীবনালেখ্যর সঙ্গে লেখকের সমগ্র ব্যাপক দৃষ্টি বা 'সর্বোপরি' দৃষ্টি সমন্বিত হওয়ায় উপন্যাসের মহাকাব্যোপম রূপ লাভের সুযোগও মিলেছে। উপন্যাসে কালক্রমে, সমাজ সভ্যতার চারিত্রিক পরিবর্তন সূত্রে তিনটি ব্যাপার খুলে গেল—content, form and spirituality। যদিও আমাদের যুগ বিশ্বাসহীনতার যুগ ঔপন্যাসিক 'steady vision of whole' ছাড়া ব্যক্তির আখ্যান তৈরিতে সক্ষম হতে পারেন না। শুধু 'intuition' দিয়ে উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। 'His writings are but results of his observation and knowledge.' পরিবর্তমান বিশ্বে, দেশে দেশে, সোভিয়েত রাশিয়ায় পরবর্তী কালে, মাত্র পনেরো বছরে, পাওয়া গেল শলোকভের 'ধীরে বহে ডন' [*And Quiet Flows The Don*] এবং আলেক্সি টলস্টয়ের *Road to Calvary*। শিশির চট্টোপাধ্যায় বলছেন : 'The love, then, is the epic—the epic of a quickly changing world.'

আজকের যুগে, ঔপন্যাসিকের খুবই কঠিন কাজ [impertive task] মানুষকে ঠিক জায়গায় স্থিত করা, মানুষের সম্পূর্ণ ছবি আঁকাও সহজ কাজ নয়, খুবই কঠিন সমসাময়িক মানুষকে বোঝা এবং প্রত্যেক স্তরে ব্যক্তিত্বের পুনর্নির্মাণ করা। 'Man is now bursting free of the bounds arbitrarity imposed on him by the capitalistic system, his mind is trying to extend itself, he is trying to make the best of all the wonderful opportunities modern life has put at his disposal. A new era of liberation is beginning.

The novel has become the epic of the era of human liberation.' [*The Novel as the Modern Epic*]।

উপন্যাসকে, আমরা জেনেছি, মানবজীবনের বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী রূপে। সেখানে গোটা মানবজীবন, সমাজ, দেশের পরিচয় সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। আধুনিক কালের জটিলতাও আমরা জেনেছি। ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণতায় মহাকাব্যোপম উপন্যাস রচিত হয় না। লেখক তাঁর সমকালে দাঁড়িয়ে অতীত কালকে, ইতিহাসের কালকেও উপন্যাসে যখন নিয়ে আসবেন, তখন মহাকাব্যিক দাবি রক্ষা করতে হলে সমগ্র মানব জীবনকে, জাতিগত সংঘর্ষকে, বর্ণময় চরিত্রগুলিকে ইতিহাসের ট্র্যাজিক উল্লাসকে, চরিত্র সমূহের বিষাদ-আনন্দ-

উচ্ছ্বাস শোককে-বিরহকে ব্যাপ্ত ল্যান্ডস্কেপে ধরতে হবে। ইতিহাসের সত্য, মানব সত্য, সমাজ সত্য, সর্বোপরি সমগ্র জীবন সত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাসে অবশ্য অন্বিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ আমাদের মনে পড়বে। অবশ্য বিমিশ্র চরিত্রের উপন্যাস আছে বলে সকলের কাছে এ দাবি থাকে না। কেননা সব উপন্যাসই সমগ্র মানবজীবনশিল্প হয়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ epic novel হতে পারে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস epic novel শ্রেণীভুক্ত হলেও epic novel মাত্রই ঐতিহাসিক নয়।

Cuddon বলছেন : 'In the last hundred years or more the novel, the cinema and, to a lesser extent, the theatre, have been much favoured media for narratives on an epic scale. In retrospect it seems fairly logical that as the novel developed so the novelist would find it an increasingly suitable vehicle for a grandiose treatment of individual and national destiny. Indeed there has been an impressive number of novels which can fairly be described as epic in their range and magnitude.' [*Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*]. মহাকাব্যোপম উপন্যাসের কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত—হেরমান মেলভিলের *Moby-Dick* [1851], টলস্টয়ের *War and Peace* [1865-72], আনা কারেনিনা [1875-6] ; জারোস্লাভ হাজেকস-এর *The good Soldier Schweik* [1920-23] 'a comic epic in the picaresque tradition.' জয়েসের *Finnegans wake* [1939], স্টেইনবেকের *The Grapes of Wrath* [1939], আইভো আনড্রিকের *Travnicka Kronika* [Bosnian Story নামে অনূদিত, [1945], প্যাট্রিক হোয়াইটের *The Tree of Man* [1956] এবং *Voss* [1957] এবং পাস্তেরনাকের *Dr. Zhivago* [1957]।

একটি মহাকাব্যোপম উপন্যাসের বিশ্লেষণ

আমরা রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে আলোচনা করেছি। 'গোরা' কিংবা 'সত্যাসত্য' মনে রেখেই বোঝার সুবিধার্থে মহাকাব্যোপম উপন্যাসের আলোকে রাজসিংহকেই বিশ্লেষণ করে দেখব।

সমারসেট মম টলস্টয়ের *War and Peace* সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, '*War and Peace* is surely the greatest of all novels···No novel with so grand a sweep, dealing with so momentous a period of history and with so vast an array of characters was ever been written before nor I surmise will ever be written again, [*Ten Novels and their Authors*]। মমের উক্তিতে মুগ্ধতা থাকলেও এবং তুলনীয় না ভাবলেও কথাগুলি রেখে আমরা উল্লেখ করতে পারি রাজসিংহও একটি মহাকাব্যোপম উপন্যাস, যেখানে মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ঔরঙ্গজেবের দেশকাল, সমাজ, রাষ্ট্রজীবন, প্রতিপক্ষ রাজপুত জাতির যুদ্ধ, অসম সাহসিকতা, বর্ণময় রক্তাক্ত যুদ্ধের তূর্যনিনাদে পরিবেশের জটিলতা, ঐতিহাসিক চরিত্র, অনৈতিহাসিক বা কাল্পনিক চরিত্রের মিশ্রণে, প্রেম-কামনাবাসনা-ভোগলিপ্সার দ্বন্দ্বে সংঘাতময় ঘটনা চমৎকার গদ্যভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ধ্বনিত হয়েছে মানবজীবনের আর্তনাদ ও

প্রতিপক্ষের উল্লাস। রবীন্দ্রনাথ কথিত ইতিহাসের বিশেষ সত্য ও সাহিত্যের নিত্যসত্যের মিলনে এই উপন্যাস রচিত বলে এটি খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যাকে ঐতিহাসিক রস বলেন, যা কিনা মহাকাব্যের প্রাণ, রাজসিংহে তা প্রতিফলিত বলে এটি এপিক নভেলের গোত্রভুক্ত হতে পেরেছে।

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি বলে তাতে অন্যান্য প্রাচীন বা পরবর্তীকালের শিল্পকর্ম গুলির সন্ধান পাওয়া যেতেই পারে। ই এম ডবল্যু টিলইয়ার্ড বলছেন : 'the novel can answer to most of the habits of mind on which the literary kinds can be truely based. It can belong the tragic or the satiric or the picaresque or the idyllic or the epic kind' [*The Epic strain in the English Novel*]। রাজসিংহে এই epic kind-এর সুস্পষ্ট লক্ষণ সুচিহ্নিত।

রাজসিংহ'র 'Vast panorama' বা 'Wide Sweep' সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই 'বঙ্কিমবাবু যেন এই দিগন্ত প্রসারিত ধূসর মৃত্তিকাপটে তাঁহার বইখানি ছাপাইয়া মধ্যাহ্ন রৌদ্রের সোনার জল করা অনন্ত নীলাকাশের মলাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন।' [রবীন্দ্রনাথ]। এই যে বিশাল পটে বিধৃত উপযুক্ত জীবনকাহিনী, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'গল্পটা যেন সৈন্যদলের চলার মতো; ঘটনাগুলি বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।' [রাজসিংহ নূতন পরিমার্জিত সংস্করণ, আধুনিক সাহিত্য]। এই গতিবেগ উপন্যাসের কাহিনীবস্তু বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হতে পারে।

ঔরঙ্গজেব জেনেছেন চঞ্চলকুমারী তাঁর চিত্রদলন করেছেন, তিনি রূপসিংহের বংশ লাঞ্ছিত করবার অভিপ্রায়ে চঞ্চলকুমারীকে [চারুমতীকে] বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। রাজপুত রমণী রাজসিংহের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, রাজসিংহ তাঁকে বিবাহ করেন, যুদ্ধ বাধে ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের মধ্যে। জাতিগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ, নৈতিকতায় বলীয়ান রাজসিংহ ধর্মশূন্য ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করেন। অসম্ভব বেগে ঘটনাবলী ধাবিত হয়েছে। ঘটনাবিন্যাসও সুসংহত। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেব—ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসার উপকাহিনী ; যুক্ত হয়েছে মাণিকলাল নির্মলকুমারী ; নির্মলকুমারী-ঔরঙ্গজেব এপিসোডগুলি। সেখানেও সংঘাত, রহস্য, কৌশলী ভূমিকা। আর সবচেয়ে জীবন্ত আধাঐতিহাসিক আধাকাল্পনিক চরিত্র জেবউন্নিসা ভোগলিপ্সা-অত্যাচার-প্রেম-বিষাদ-ট্র্যাজিক পরিণাম—হয়ত প্রেমের স্বাদে শেষ অবধি 'অনন্ত জগৎবাসিনী রমণী'। ইতিহাসের উপাদান ও উপন্যাসের উপাদান সাঙ্গীকৃত হয়ে বিশাল ব্যাপ্ত জীবনকালের প্রেক্ষাপটে মহাকাব্যিক উপন্যাসের আস্বাদন সঞ্চার করেছে। কোথাও বিরতি নেই, এমন গতিসম্পন্ন শোভাযাত্রা অকল্পনীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রাজসিংহও ঝর্নার নদী হয়ে সমুদ্রে পৌছুনোর ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার সঙ্গে যাত্রা করেছে। বলছেন, 'তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে, প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রু নিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক-বা কালপুরুষ

লিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক-বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।' এই যে 'একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত' হওয়া মহাকাব্যোপম উপন্যাসের লক্ষণ।

আমরা দেখতে চেয়েছি, এখানে অনেকগুলি চরিত্র, অনেকগুলি কাহিনী। রাজপুতানার পার্বত্যময় প্রদেশ থেকে দিল্লীর মোগল হারেম পর্যন্ত ঘটনার বিস্তার। একদিকে সম্রাট, অন্য দিকে রাজা। একদিকে আদর্শ-নারী চঞ্চলকুমারী, অন্যদিকে চরিত্রভ্রষ্ট উদিপুরী। একদিকে দরিয়া অপর দিকে ভোগলালসায় ও প্রেমে অস্থির জেবউন্নিসা। মাঝখানে মবারকের প্রণয় ও যন্ত্রণা, স্বপ্নভঙ্গ ও স্বপ্নের দ্বন্দ্ব। নির্মলকুমারী, মাণিকলালের ঘটনাবিন্যাস চমকপ্রদ। উপন্যাসের গঠন বা ফর্ম, উপাদান উপকরণ, কাহিনী পরিকল্পনা, ইতিহাস ও উপন্যাসের মেলবন্ধন, বিশালতায় বিস্তীর্ণ হয়েও একটি সামগ্রিকতায়, বা সমগ্রের সংহতিতে, একটি ঐক্যবোধে বঙ্কিম সংগঠিত করতে পেরেছেন বলেই রাজসিংহ মহাকাব্যোপম উপন্যাস হয়েছে।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

আত্মজীবনী ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস সমার্থক নয়। আত্মজীবনী ব্যক্তিমানুষের কথকতায় স্বীয় জীবনকথা। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে ব্যক্তিগত জীবনকে লেখক গল্পের উপাদানের সঙ্গে নানাবিধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করেন। 'Autobiography is a biography written by the subject about himself. It is to be distinguished from the memoir—in which emphasis is not on the author's developing self but on the people he has known and the events he has witnessed—and from the private diary or journal, which is a day to day record of the events in a man's life which he writes for his own use and pleasure, with little or no thought of publication.' [M. H. Abrams]।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখা সহজ নয়। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, 'নিজের জীবনের ঘটনা কোনো কোনো সময়ে বৈচিত্র্যের দিক থেকে উপন্যাসের কিনারা স্পর্শ করতে পারে। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য লেখকের বাস্তব জীবনের মধ্যে সব সময়েই উপন্যাসের উপাদান থাকে না, অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার জাল বুনে সৃষ্টি হয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। শুধু উত্তম পুরুষে আত্মকথন বিবৃত হলেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হয় না।' [ভূমিকা : নজরুল ইসলাম, বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস]।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লেখক ও নায়ক অনেক ক্ষেত্রে একীকৃত হয়ে যান। প্রচলিত দৃষ্টান্ত, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', রোমা রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ', চার্লস ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড'। শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের অভিমত, 'আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস আমরা সেই উপন্যাসকেই বলব, যেখানে লেখকসত্তা ও নায়কসত্তা প্রায় এক হয়ে গেছে।' [জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র]। কিন্তু আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখেননি টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ।

উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে শিল্পিত করে তোলা বা তার শিল্পরূপ দেবার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। বিশেষ জীবনের উপাদান সমূহ উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হলে তা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হয় না। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মতে তা হয়ে ওঠে Record বা Chronicle। তাঁর বক্তব্য 'সাহিত্যের মূল জিনিস রস। এজন্য উপন্যাস বলেই এ বিশেষ চরিত্রটিকে প্রচুর কল্পনার প্রয়োজন। শুধু এইটুকুই নজর রেখে যেতে হবে যে মাত্রাল্পতায় বা মাত্রাধিক্যে এমন কিছু না হয়ে যায়, যাতে রসাভাস ঘটে এবং চরিত্রটি ক্ষুণ্ণ হয়।' [সরোজ দত্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য]।

সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য [অলোক রায় সম্পাদিত] গ্রন্থে শ্রীসরোজ দত্ত দেখিয়েছেন, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস কি কি বিশিষ্টতা নিয়ে আমাদের সামনে মূর্তি পরিগ্রহ করে ; সূত্রাকারে তাঁর বক্তব্য সাজিয়ে নিয়ে বলা যায় :

১. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসকে ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপঞ্জী প্রভাবিত করে।

২. অভিজ্ঞতার elemental প্রয়োগই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে শোভন।

৩. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ ধরা দেবেন না, অথচ নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে উন্মুখ।

৪. এই দ্বিধাই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লেখককে নিরঙ্কুশ হতে দেয় না কালের প্রেক্ষাপটে। 'ঘটনাস্থল হিসেবে কাহিনীর বিস্তার যেমনই ঘটুক না কেন, লেখকের নিরিখে তার সসীমরূপই আমাদের চোখে ধরা পড়ে।'

৫. 'ঠিক এই জন্যেই এগুলি কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজস্বতার ছবি, ছায়াসূর্যে ম্লান হয়ে আছে। আবেগের উষ্ণতায় কথাকার অস্থির।'

৬. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের 'নায়ক চরিত্রে বিকাশের একটি ক্রম থাকে ঠিকই, কিন্তু জীবনসন্ধিৎসু হয়ে পরিণতির দিকে এগোয় না।'

৭. ফলে, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের 'মূল চরিত্রটি হয়ে পড়ে flat—স্বভাবতই গঠনের দিক থেকে শৈথিল্য দেখা দেয়।'

অতঃপর সাতটি সূত্র শেষে সমালোচকের অভিমত, 'জীবনের ঘটনার তথ্যভারকে কিছু পরিমাণে আপ্লুত করে আনুষঙ্গিক হৃদয়াবেগের নিখুঁত অনুবৃত্তিতে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস পাঠের বিশেষ স্বাদটুকুকে ধরে দেওয়া যাবে না ; প্রয়াসী হ'লে, বড় জোর বলা যাবে, প্রায় জনহীন এক দ্বীপপুঞ্জের বনসৌন্দর্যের মতোই এদের elemental দিকটি আমাদের আচ্ছন্ন করে।'

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ ব্যাখ্যা করেছেন, 'মানুষ নিজেকে বর্ণনা ও বিচার করিতে পারে না। নিজের মানসিক আনন্দ বেদনাজনক অনুভূতি ও বহির্ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে পারে মাত্র। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসেও লেখক নিজেকে কিছুটা নিষ্ক্রিয় দর্শক ও সমালোচকের ভূমিকায় রাখিয়া অপর চরিত্রগুলির ক্রিয়া ও আচরণ এবং উহাদের অন্তর্নিহিত দোষগুণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন।' [শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার]।

জীবনী, আত্মজীবনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ইতিহাসের, উপন্যাসের সম্পর্ক-সাযুজ্য একালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাধারণভাবে এসবের মধ্যে যে পার্থক্য, তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। রজার ফাওলারের অভিধানে, গারেথ গ্রিফিথের আলোচনায় জানা যায়, 'The traditional distinctions between biography, personal history (diary/confession) and novel (especially first person narrative and/or tape-recorded novels) are coming to be questioned.' আফ্রিকার Achebe, Ngugi, Soyinka এবং নিগ্রো-আমেরিকান সার্কেলের Baldwin, John Williams, Jean Tooner-এর রচনাসূত্রে মূল্যায়িত হয়েছে, 'autobiographical art is not a device for summing up the accumulated wisdom of a life-time but a means of defining identity.' এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাস ও আত্মজীবনীর পার্থক্য প্রায় অর্থহীন হয়ে উঠেছে। 'A novel like Ralph Ellison's *Invisible Man* (1965) and an autobiography like J. P. Clark's *America, Their America* (1964) are united beyond their different forms in a single gesture of passionate self-exposure.'

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' [১ম পর্ব-১৯১৭, ২য় পর্ব ১৯১৮, ৩য় পর্ব ১৯২৭, ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩], তারাশঙ্করের

একটি বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' সার্থক ও শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তার অনেক লক্ষণই এই উপন্যাসে পাওয়া যাবে। চার পর্বে সম্পূর্ণ হলেও স্বতন্ত্র ভাবে এখানে শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব সামনে রেখেই আমরা আলোচনা করতে পারি।

মোহিতলাল মজুমদার ব্যাখ্যা করেছেন, 'এই কাহিনীতে দুইটি ভাঁগ বা ধারা আছে ; একটা লেখকের আত্মজীবন বা আত্মচরিত, আর একটা সেই জীবন সম্বন্ধে চিন্তা বা তাহার সমালোচনা। প্রথমটি আত্মপ্রকাশ, দ্বিতীয়টি আত্মচিন্তা ; আত্মপ্রকাশের মধ্যেই যে আত্মদর্শন আছে তাহাই আরও সত্য, আরও গভীর, আত্মচিন্তায় সেই চেতনা আর নাই, সেই অপরোক্ষ অনুভূতি আর নাই।' [শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র]।

আত্মজৈবনিক উপাদান শ্রীকান্ত উপন্যাসে শিল্পরূপ লাভ করেছে। অবশ্য শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' সম্পর্কে যাবতীয় কৌতূহল অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গে বলেছেন বানানো গল্প। শ্রীকান্ত তিনি নন। সবটাই কাল্পনিক কাহিনী। প্রথম পর্ব পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি লিখছেন, 'আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোক দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্তত করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য।' এও এক ধরনের কৈফিয়ত। এরকমই উপন্যাসের শুরুতে লিখেছেন : "আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।" এখানে শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছি। এই উপন্যাসটি তিনি লিখতে শুরু করেন ৩৯ বছর বয়সে, শেষ করেন ৫৭ বছর বয়সে। তাঁর 'ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ন বেলা'র উল্লেখ দেখে শরৎচন্দ্রকে কালিদাস রায় প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, 'জীবনের অপরাহ্ন বেলা তো শ্রীকান্তের।' [শরৎসান্নিধ্যে]। অজিতকুমার ঘোষ ব্যাখ্যা করেন, 'শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক ভঙ্গিতে রচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে এমন সব ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণনা করিয়াছেন যেগুলির সহিত তাঁহার নিজের বাস্তব ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি এই বইতে যে জীবনদৃষ্টি ও মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা শুধু শ্রীকান্তের নয়, তাহা তাঁহার নিজেরও বটে। এ-সব কারণে খুব সঙ্গত ভাবেই পাঠকসমাজ শ্রীকান্তের সহিত তাঁহার জীবনের সাযুজ্য ধারণা করিয়া থাকেন।' [শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার]।

শ্রীকান্তর প্রথম পর্বে কুমার বাহাদুরের মজলিস, পিয়ারী বাইজির সঙ্গে জড়িত হওয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ, ইন্দ্রনাথ ও অন্নদা দিদির কাহিনী, নতুনদা, রামবাবু ও তার স্ত্রীর স্বার্থপরতার আঘাত, নীরুদিদি, গৌরী তেওয়ারির মেয়ের দুঃখ ইতাদির অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে আমরা শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করলে দেখব, কোথায় যেন উভয়ক্ষেত্রের একময়তা আছে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : 'শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতার উপকরণেই গঠিত। এমনকি শ্রীকান্তের সহিত শরৎ-জীবনের একটি অদ্ভুত সমান্তরতা আছে। কিন্তু আবার একথাও সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে সবচেয়ে আত্মগোপন করে আছেন।' [শরৎপরিচয়]

শ্রীকান্তর ছেলেবেলার সময় অতিবাহিত হয়েছে দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথের সাহচর্যে। পরিচয় ঘটেছে অন্নদা দিদির ও শাহজীর সঙ্গে। অন্নদা দিদি ও ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত সারাজীবন ভুলতে পারেননি। পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, যে কিনা তারই রাজলক্ষ্মী, তাকে দেখে শ্রীকান্তর পুরনো আবেগ ও সম্পর্ক জেগে ওঠে। পিয়ারীর রাজলক্ষ্মী সত্তা তাঁকে আঁকড়ে ধরতে চায়, বঙ্কুর মা পিয়ারী তাকে বিদায় দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। নারী মনের দুর্লভ সম্পদ লাভ করেন শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের চারটে পর্বেই একটি সুর 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।' বাল্যকালে, বঁইচি ফলের মালা গেঁথে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পরিয়ে দিত, সেই থেকে ভালোবাসা, রাজলক্ষ্মী সারাজীবনে ভুলতে পারেনি। 'পিয়ারী বাইজি রাজলক্ষ্মীর বাহিরের সত্তা মাত্র।'

এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে কাহিনীগ্রন্থন সংহত নয়, শিথিল অঙ্গবন্ধন ; তবু শ্রীকান্ত চার পর্বে সম্পূর্ণ শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কিনা, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়। উপন্যাসের নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই ; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। কিন্তু ইহার গ্রন্থন-সূত্রটা যতই শিথিল হউক না কেন, গ্রথিত পরিচ্ছেদগুলির এক একটি মহামূল্য রত্ন।' [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]। কিন্তু সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই অভিমত প্রকাশ করেছেন, 'অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই।' [শরৎচন্দ্র]। অজিতকুমার ঘোষের মূল্যায়ন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাত্ত্বিকতার আতিশয্য সত্ত্বেও তিনি এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তার নিবিড়তম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীসত্তার প্রকৃষ্টতম পরিচয় লক্ষ্য করেছেন।

শরৎচন্দ্রের চিন্তা, জিজ্ঞাসা, সমাজভাবনা, নারীর মূল্য নিয়ে যেসব কথা এখানে শ্রীকান্তের জবানিতে জানা গেছে, তাতেও এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের আড়ালে থেকেও প্রত্যক্ষগোচর হয়েছেন। 'স্ত্রীলোককে আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না,' 'নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভালো কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নেই।' কিংবা 'যে সমাজ এই দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না।' শ্রীকান্তের এইসব উক্তিও মূলত শরৎচন্দ্রেরই। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী হয়েও উপন্যাস। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন, এভাবে, 'আত্মকাহিনীর ছলেই হোক বা কোনো নায়ককে স্থাপিত করেই হোক, সাধারণত এ জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখকের জীবনের ছায়াপাত করে বলে পাঠকদের কাছে এদের একটা পৃথক মূল্য আছে।' [বাংলা উপন্যাসের কালান্তর]।

পত্রোপন্যাস

পত্রাকারে বা পত্র বিনিময়ের সাহায্যে যখন উপন্যাসের আখ্যানবস্তু বিস্তার লাভ করে তখন তাকে বলা হয় পত্রোপন্যাস বা Epistolary Novel. জে. এ. কাডন এক কথায় বুঝিয়েছেন, 'A novel in the form of letters.' পত্রোপন্যাসের ক্ষেত্রে, কেউ কাউকে পত্র লিখছে এবং তার লিখিত পত্রের মাধ্যমে শুধু সেই চরিত্রই পরিস্ফুট হচ্ছে না, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধও নিরূপিত হচ্ছে। এই ধরনের উপন্যাসে লেখকের ভূমিকা তেমন জোরালো হয়ে ওঠে না। পত্রবিনিময় মাধ্যমটিতে চরিত্রাঙ্কন প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। 'প্রত্যক্ষ বর্ণনাধর্মী, আত্মকথনধর্মী ও তথ্যাশ্রয়ী প্রামাণিকতা-ধর্মী'—উপন্যাস রচনার এই তিন রীতির মধ্যে শেষোক্ত রীতিই পত্রোপন্যাসের আশ্রয়।

পত্রোপন্যাস ও আত্মচরিতমূলক উপন্যাস এক নয়। পত্রোপন্যাসে চরিত্ররা স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতার, বিশেষ বিশেষ অনুভূতিকে, সমস্যা ও জিজ্ঞাসাকে অকপটে উপস্থাপন করেন ব'লে পাঠক 'মানসিক নৈকট্য' অনুভব করেন। পত্র লিখন শুধু একপক্ষীয় ব্যাপার নয় ; কিন্তু আত্মচরিতমূলক উপন্যাসে উত্তমপুরুষে কথা বলেন একটি মাত্র চরিত্র। একটি চরিত্র উত্তমপুরুষে কথা বললে তার অন্তর্জগৎ তার ইচ্ছানুযায়ী উন্মোচিত হচ্ছে, লেখকেরও করণীয় খুব বেশি থাকে না, পত্রোপন্যাসে লেখকের নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা ও চরিত্রসমূহ থেকে বিশেষ দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। একজনের চিঠির বিষয়বস্তুর প্রতিক্রিয়া অন্য চরিত্রে কিভাবে কতটুকু ঘটছে, সে বিষয়ে পাঠকের কৌতূহলও নিরন্তর বাড়তে থাকে।

পত্রোপন্যাসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন ইংরেজি সাহিত্যের আদি ঔপন্যাসিক রিচার্ডসন, "Much more lovely and affecting must be the style of those who write on the height of the present distress, the mind tortured by the pangs of uncertainty, than the dry narrative, unanimated style of a person relating difficulties and dangers surmounted, the relater perfectly at ease ; and if himself unmoved by his own story, then not likely greatly to affect the reader" [ভূমিকা : *Clarissa*]।

পত্রোপন্যাস অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক হয়ে থাকে, একটা সহজিয়া ও স্বাভাবিক প্রকাশ ভঙ্গিমা থাকলেও, বক্তব্য অনেক সময়ই দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। এই ধরনের উপন্যাসে চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ চরিত্রের আত্মকথনরীতিই তাকে স্বতন্ত্র করে গড়ে তোলে।

পত্রোপন্যাসে প্রত্যেক চরিত্রের নিজস্বতা ও আত্মকথনরীতির স্বাতন্ত্র্য রচনাশৈলীর উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

কিন্তু পত্রোপন্যাসের দুর্বলতাও লক্ষ্য করা কঠিন নয়। এখানে চরিত্র এতটাই অকপট, কতটুকু তাকে বলতে হবে বা কতটুকু খোলামেলা হওয়া জরুরি, এই বোধের অভাব তাকে 'বেআব্রু' করে তোলে। মনে রাখতে হবে, গোপনীয়তাও একটা শিল্প। পত্রোপন্যাসে আত্মসমীক্ষার সুযোগ থাকলেও আত্মপ্রশংসার ও আত্মঅহমিকা প্রদর্শনের প্রলোভন থেকে মুক্ত হতে না পারলে কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। পত্রোপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে

পত্রলেখার বাতিকেও ভুগতে থাকে। 'স্যার চার্লস গ্রাণ্ডিসনে'র নায়িকা হ্যারিয়েট বায়রন প্রসঙ্গে লেসলি স্টিফেনের মন্তব্য ছিল, এই চরিত্র একই দিনে তিনখানি চিঠি লেখেন, চোদ্দ, ছয় ও বারো পৃষ্ঠার, পরের দুদিনে আটান্ন পৃষ্ঠার চারটি চিঠি, এত লেখার পরে আরও ছয় পৃষ্ঠা সংযোজিত হলে মোট ছিয়ান্নব্বই পৃষ্ঠায় দাঁড়ায়। এটা তো বাতিক। দুর্বলতা। ত্রুটি। কিন্তু এই সব ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে পারলে পত্রোপন্যাস একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকৌশল রূপে বিবেচিত হতে পারে।

পত্রোপন্যাসকে চরিত্রপ্রধান উপন্যাস বা Novel of characterও বলা হয়ে থাকে। বিশেষত রিচার্ডসনের *Pamela* (১৭৪০), *Clarissa Harlowe* (১৭৪৭, ১৭৪৮) উল্লেখযোগ্য। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস *Sir Charles Grandson* (১৭৫৪) পত্রাকারে লিখিত। এছাড়াও উল্লেখ করা যায়, টোবিয়াস স্মলেটের *Humphry Clinker* (১৭৭১), রুশোর *La Nouvelle Heloise* (১৭৬১) এবং ল্যাকলোসের *Les Liaisons Dangereuses* (১৭৮২)। Cuddon-এর মন্তব্য, 'Since the 18th C. the form has been little employed, but it is not unusual for letters to make up some part of a novel.' [*A Dictionatry of Literary Terms*]।

ইংরেজিতে প্রথম চরিত্রপ্রধান উপন্যাস রচয়িতার কৃতিত্ব সম্পূর্ণত স্যামুয়েল রিচার্ডসনের। 'পামেলা' লেখার আগে থেকেই রিচার্ডসন নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের প্রেমপত্র লিখে দেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। এই সূত্রেই তাঁর পত্রোপন্যাস রচনার প্রেরণালাভ। 'পামেলা' প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো, 'Pamela is the story of a sentimental but shrewed young woman who, by prudently safeguarding her chastity, suceeds in becoming the wife of a wild young gentleman instead of becoming a debauched servant girl.' [*A Glossary of Literary Terms* : M. H. Abrams]"।

এই সূত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হল : 'The distinction between the novel of incident and the novel of character can not be drawn sharply ; but in the novel of incident the greater weight of interest is on what the character will do next and on how the story will come out, in the novel of character it is on his motives for what he does, and on how he as a person will turn out"। রিচার্ডসনের 'পামেলা'র পরবর্তী প্রকাশিত উপন্যাস ক্ল্যারিসা। এ সম্পর্কে অ্যাব্রামস-এর মন্তব্য, 'Pamela, like its greater and tragic successor, Richardson's Clarissa (1747-1748) is an epistolary novel ; that is, the narrative is conveyed entirely by an exchange of letters'।

বাংলায় সার্থক পত্রোপন্যাসের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পোনুর চিঠি', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন' ও তরুণকুমার ভাদুড়ীর 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' অংশত পত্রোপন্যাস। কিন্তু অনেকের কাছে পত্রোপন্যাস রূপে স্বীকৃত নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা' ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাস থেকে মোসলেম ভারতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থরূপ পাওয়া যায়, ১৩৩৪ (১৯২৭) সালে। এই উপন্যাস মোট সতেরোটি পত্রের সমাবেশে সম্পূর্ণ। 'বাঁধনহারা'য় নায়ক নূরুল হুদা, প্রধান নারী চরিত্র চারটি—মাহবুবা, সোফিয়া, রাবেয়া,

সাহসিকা। মাহবুবাকে কেন্দ্র করেই বাকি নারীচরিত্র বিবর্তিত। কবিজীবনের প্রস্তুতি পর্বে রচিত এই পত্রোপন্যাস সার্থক বলা যাবে না। পত্রগুলি দীর্ঘ, দীর্ঘতর। 'বাঁধনহারা' সমালোচনা সূত্রে তৎকালেই বলা হয়েছিল, "ইহাই নজরুল ইসলাম লিখিত প্রথম উপন্যাস। লেখক কবি,—তাই এই গ্রন্থে উপন্যাসত্ব অপেক্ষা কাব্যত্ব বেশী ফুটিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রসৃষ্টি যে ইহাতে একেবারেই নেই, এমন কথা বলিতে না পারা গেলেও লেখকের সে ক্ষমতা খুব পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।…লেখার সংযম উপন্যাসের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু এ-গ্রন্থের কবি-লেখক কাব্যের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়া অনেক স্থলেই সে সংযম রক্ষা করিতে পারে নাই।" [১৩৩৫ (১৯২৮), জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, 'সওগাত']। 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাস গোত্রভুক্ত হলেও এটি মূলত একটি বাঁধনহারা আলেখ্য। এখানে আত্মোচ্ছ্বাস ও শৈল্পিক সংহতি ও সংযমের পরিমিতি ও বাঁধুনির অভাব এত বেশি যে এটি সার্থক পত্রোপন্যাসের মর্যাদা পেতে পারে না।

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস একটি 'vague term' বলার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা জেনেছি এই ধরনের উপন্যাসে প্লট বা আখ্যানভাগ ও ঘটনাপ্রবাহের প্রতি যত মনোযোগ থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি চরিত্রসমূহের নৈতিক, ভাবপ্রবণ মানসজীবনের প্রতি এবং চরিত্র বিশ্লেষণের প্রতি লেখক মনোযোগী হন। 'vague term' বলার মূলে হয়ত এই অভিজ্ঞতা, এমন কোনো উপন্যাস নেই যেখানে মানবমনের পরিচয় নেই। গত দুশো বছর ধরে বিশ্বসাহিত্যে অসংখ্য উপন্যাসে মানবমনের উপাদান ছড়িয়ে আছে প্রতীক-সংকেত ইঙ্গিত-ময়তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। কাডনই এভাবে বুঝিয়েছেন : 'A vague term to describe that kind of fiction which is for the most part concerned with the spiritual, emotional and mental lives of the characters and with the analysis of character rather than with the plot and the action.' সাধারণভাবে উপন্যাসে নিটোল গল্প-কাহিনী এবং ঘটনার চমৎকারিত্ব ও আধিক্য লক্ষ্য করে থাকি। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে 'ঘটনাপরম্পরার বিবরণ' প্রাধান্য পায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, 'ঔপন্যাসিক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন।' যেহেতু উপন্যাসের বিষয় মানুষ এবং মানুষের হর্ষ, বিষাদ, আশানিরাশা কামনাবাসনায় জটিলতা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে শুধু ঘটনাপরম্পরার বিবরণেরও প্রাধান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে না, মনের কথা গুরুত্ব পাবেই। প্লট বা আখ্যানভাগের চর্চা নয়, চরিত্রাবলীর অন্তর্জগৎ উদঘাটনই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের কাজ। চরিত্রের অন্তর্জীবনের পাপড়ি উন্মোচন দুরূহ হলেও, মনোযোগী ঔপন্যাসিক রহস্যের গভীরে যেতে আগ্রহী হলে তা সম্ভব হতে পারে। মোট কথা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে চরিত্রচিত্রণ একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি।

ঔপন্যাসিক আর মনোবিজ্ঞানী এক ব্যক্তি না হলেও 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মনের প্রতিফলন যুক্ত উপন্যাস' রচনার কাজ সম্ভব। একেই আমরা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলছি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে ও বিশ শতকের সূচনাকালে ইউরোপে যেসব বিরাট ঘটনা ঘটেছিল তার প্রভাব উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। ফ্রয়েড, মার্কস, আইনস্টাইন ও প্লাঙ্কের আবিষ্কার আমাদের প্রথানুগত সংস্কারকে ভেঙে দেয়। 'মানুষের মনের রিরংসাচালিত তিনটি স্তর, সামাজিক জীবনে শ্রেণীসংঘাত ও তৎপ্রসূত গতিময় সংশ্লেষ সাধন, পদার্থ জগতে বহুবিধ ঘন বা আয়তনের অস্তিত্ব স্বীকার ও বিদীর্ণ অণুর প্রচণ্ড ক্ষমতা—এইসব চিন্তা ও জগতের দিকে তাকাবার ভঙ্গিটাই বদলে দিয়ে গিয়েছিল।···উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এসব চিন্তা, বাতাসের মধ্যে বীজাণুর মতো ঘুরে বেড়াতো। এবং তার ফলেই, রচনাকালে, কোনো না কোনো ভাবে এদের প্রভাব বা অভিঘাতকে এড়ানো সম্ভব হয়নি।' [মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস—অলোক রায় সম্পাদিত সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য]। এইসব কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে, হেনরি জেমস যাকে অভিজ্ঞতা বলতে 'মানসিক আবহাওয়া' বোঝেন তার অনুসন্ধানের লক্ষ্য নিয়ে রচিত হল ডরোথি রিচার্ডসনের 'পিলগ্রিমেজ', মার্সেল প্রুস্তের 'রিমেমব্রান্স অব থিংকস্ পাস্ট' জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' ভার্জিনিয়া উলফের 'দ্য ভয়েজ আউট' উপন্যাস—এসব উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্জীবন ও

অন্তর্জগতের পরিচয়ই স্পষ্ট হয়েছে। মনোজীবনের অন্তর্গত 'অতলস্পর্শ রহস্য' উদ্‌ঘাটনে এই ধরনের উপন্যাস 'অন্তর্মুখীন', "স্মৃতিরোমন্থনের বেদনা-বিধুরতায়, মনোবিশ্লেষণের গভীরতায় এই সমস্ত শিল্পী মনের প্রতিবেশকেই ('atmosphere of the mind') অর্গলমুক্ত করেছেন। এ কারণে এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ গল্প, চিরাচরিত প্লট অনেক সময়ই অস্বীকৃত। অনেক উপন্যাসে কাহিনীর প্রায় মৃত্যু ঘটেছে।" [রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার : বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, 'গ্রন্থ পরিক্রমা', ৬ষ্ঠ বর্ষ/৫ম সংখ্যা]। এইসূত্রে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের আধুনিকতম একটি ধারা হল চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস।

বাংলা উপন্যাসে সাধারণভাবে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ নিজেই দাবি করেছেন 'চোখের বালি' (১৯০৩) থেকেই এই ধরনের উপন্যাসের সূচনা। তিনি বলছেন, "শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।" [সূচনা : চোখের বালি। রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড]। রবীন্দ্রনাথের এই দাবির যৌক্তিকতা অস্বীকার না করেও এর সঙ্গে সামান্য সংযোজন সম্ভব। তা হল 'রজনী'। তাই অন্য মতের উল্লেখও জরুরি। 'ঔপন্যাসিক হিসেবে এদেশে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাইরের দৃশ্যমান জগৎ থেকে মানবমনের চিরন্তন লীলাচাঞ্চল্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।' [শিশির চট্টোপাধ্যায় : উপন্যাস পাঠের ভূমিকা]। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'বঙ্কিমরচনাবলী'র সম্পাদকীয়তেও বলা হয়েছে, 'ইহাই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।···নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতের 'রজনী'তে ঘটনা বৈচিত্র্যের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। সে যুগের বর্ণনাবহুল রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে ঘটনাপরম্পরাই নয়, তার আড়ালে তিনি রজনী, শচীন্দ্র, লবঙ্গলতা ও অমরনাথ চরিত্রচতুষ্টয়ের অন্তর্বিষয়ের প্রকাশে যত্নবান হয়েছিলেন। কিন্তু 'রজনী'তে যা সম্ভব হয়নি, তা সম্ভব হয়েছে 'চোখের বালি'তে। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে রবীন্দ্রকথিত 'মনের সংসারে কারখানা ঘরে' আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনির ফলে যে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে ওঠে, তা থেকে মানবচেতনার রহস্য পরতে পরতে উন্মোচনের দৃশ্য লক্ষ্য করি। এভাবেই একে একে জন্ম নিয়েছে 'গোরা', 'ঘরেবাইরে', 'চতুরঙ্গ'। পরবর্তীকালে আরও নানাজনের রচনাকর্মে তা নিখুঁত হয়ে উঠেছে। স্বীকার করতেই হবে, সচেতনভাবে, রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, 'সাহিত্যের নবপর্যায় পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে, আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।' এই 'আঁতের কথা' বের করে দেখানোই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের কাজ।

একটি বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের মুখ ঘটনার দিক থেকে চরিত্রের দিকে ফেরানো হয়েছে। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চরিত্রচিত্রণ বিশিষ্ট পদ্ধতি, তা 'চোখের বালি'তে লক্ষ্য করি। 'চোখের বালি' ৫৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই উপন্যাসে ঘটনার স্থান ও কালগত বাঁধুনি অত্যন্ত সংহত। এখানে মূলত চারটি প্রধান নরনারীর কাহিনী—মহেন্দ্র, আশা,

বিনোদিনী ও বিহারী। উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্র মহেন্দ্র হলেও কেন্দ্রীয় ভূমিকা বিনোদিনীর।

'চোখের বালি'র প্রায় সমকালীন রচনা 'নষ্টনীড়'। ১৯০১-এ 'নষ্টনীড়' শেষ হয়েছে। ১৯০৩-এ 'চোখের বালি'। এই দুটি রচনাতেই—গল্পে ও উপন্যাসে—বিষবৃক্ষের চাষ হয়েছে। তাঁর সামনে ছিল বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী। নষ্টনীড় ছোট গল্প। এখানে ভূপতি-চারুলতা-অমলের মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সূক্ষ্ম ও মনস্তত্ত্বসম্মত। কিন্তু ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতি চিত্রিত করার সুযোগ অনেক বেশি। নষ্টনীড়ে 'নিষিদ্ধ প্রেমের সম্ভাবনা ও উন্মেষ' মাত্র লক্ষ্য করি। কিন্তু সে তুলনায় চোখের বালিতে তা সত্যসত্যই ব্যাপ্ত ও ব্যাপক। অপরদিকে, বিষয়ের দিক থেকে বিষবৃক্ষে যেমন বিধবাপ্রেমের সমস্যা দেখানো হয়েছে, 'চোখের বালি'তেও অনেকটাই অনুরূপ সমস্যার উপস্থাপন। বিষবৃক্ষে যেমন নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর জীবনে কুন্দ'র আবির্ভাবই সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়, চোখের বালিতে মহেন্দ্র-আশার জীবনে বিনোদিনীর উপস্থিতি বিপর্যয় ও বিপত্তি সৃষ্টি করে। সমালোচকের অভিমত : "বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রবল আদর্শবাদী, 'বিষবৃক্ষ' ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এ দাম্পত্যপ্রেমের মহিমা প্রচারই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই অবৈধ প্রেমের সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানসম্মত স্তরগুলি বিশ্লেষণ করা তিনি অবাস্তব ও নীতিবিগর্হিত মনে করেছেন, কেবল অবৈধ প্রেমের শোচনীয় পরিণাম দেখাবার জন্যেই তিনি অতিমাত্রায় আগ্রহশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে সমাজের চক্ষে অপাত্রসংন্যস্ত প্রেমের স্তরগুলি ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে মানবমনের স্বাভাবিক বাস্তবস্বরূপ উদঘাটন করেছেন।" চোখের বালি, এই দিক থেকে বাংলা উপন্যাসে বিশিষ্ট।

'চোখের বালি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনোদিনী। তার ওপর ভর করে আছে উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক পরিকাঠামো। এই বিধবা নারী জীবনবিমুখ নয়। তার মধ্যে রয়েছে কামনাবাসনা, প্রতিহিংসা, অভিনয়ের ছলনা ও বিরুদ্ধাচারণের সাহস। সে বালবিধবা নয়। অন্তত অন্যান্য মেয়ে অপেক্ষা তার বিবাহ অধিক বয়সেই হয়েছে। তার মনোগঠন ও মনোজীবন আকর্ষক হয়েছে কয়েকটি স্তরে। প্রাথমিক ভাবে, সদ্য বিবাহিত মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনেব পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিহারীকে লেখা মহেন্দ্রের চিঠি বিনোদিনীকে 'মাতাল' করে তুলেছে। আশা'ব মধ্য দিয়ে বিনোদিনী নিজেকেই দেখতে চেয়েছে। কিন্তু কঠোর বাস্তব তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, যে আশা যা যা লাভ করছে, সে লাভ করতে পারত, কিন্তু না পাওয়ায়, অপ্রাপ্তিজনিত কারণে সে নিজেকে বঞ্চিত ভেবেছে। সে ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছে। মহেন্দ্রকে সে সহজেই জয় করতে পেরেছে, বিহারীকে ভালোবেসেও পায় না, রাজলক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিরোধ সব মিলিয়ে মনোজগতের জটিল আঁকাবাঁকা ছবিতে উপন্যাস মনস্তাত্ত্বিক গুণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

'চোখের বালি'র উপন্যাসে দশম পরিচ্ছেদ থেকে বিনোদিনীর প্রভাব ও আধিপত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। "চোখের বালিতে যে চারজন নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে আশা-বিহারীর সম্পর্কটিও অন্যতম। বিনোদিনী আবির্ভূত হওয়ার আগেই একটি জটিলতার বীজ সেখানে ছিল। সুতরাং বিনোদিনী আবির্ভূত হয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল তার জন্য 'চোখের বালি'র পটভূমিকা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।" বিহারীর তুলনায় মহেন্দ্রর মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বেশি ; কিন্তু সর্বাধিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, অন্তর্মুখ চেতনা ও চরিত্রের ভেতরমহলের টানাপোড়েন বিনোদিনী-তেই পরিলক্ষিত। আশা ও মহেন্দ্র'র বিবাহের

বিরোধী ছিলেন রাজলক্ষ্মী ; অন্নপূর্ণা, এক্ষেত্রে নানাভাবে আঘাত পেয়েছে। রাজলক্ষ্মীর সূত্রেই বিনোদিনীর আত্মপ্রকাশ। অস্থিরচিত্ত, অসংযত, অসহিষ্ণু, প্রকৃতিগত ভাবে অস্থির ও প্রবৃত্তি তাড়িত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর পরিচয়ই এ উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণের সুযোগ এনে দেয় ; বিনোদিনীর মোহিনী মায়া-ছলাকলায় একদিকে সে বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে অপর দিকে আশার বুদ্ধিহীনতা ও বিহারীর প্রতি ঈর্ষা তাকে দিকনির্দেশহীন করে তুলেছে। বিনোদিনী এতটাই বুদ্ধিমতী ছিল, একদিকে মহেন্দ্র তার প্রতি আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে ভূমিকা নিয়েছে, অন্যদিকে তার ব্যক্তিত্বের দাপটে আশাকে অভিভূত করে তাদের দাম্পত্যজীবনে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হলেও প্রেমিক হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি। বিহারীকে বিনোদিনী জানিয়েছে—'মহেন্দ্র নিরেট অন্ধ, সে আমাকে কিছুই বোঝে না।' মহেন্দ্রকেও বলেছে—'ভীরু কাপুরুষ···না জানো ভালোবাসিতে, না জানো কর্তব্য করিতে।···লুকোচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এ দিক একবার ওদিক··· তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে।' মহেন্দ্র'র প্রতি বিনোদিনীর ভালোবাসার প্রশ্নে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। যে বিনোদিনী ঘটনাক্রমে বিহারীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও আকৃষ্ট হয়েছে, মহেন্দ্রকে সে নানা ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছে, এযেন অনেকটা আত্মআবিষ্কারের প্রচেষ্টা—"যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই, কি মারিতে চাই, তাই বুঝিতেই পারিলাম না।'' লক্ষ্য করি, মেসে থাকার সময় মহেন্দ্র আশার কাছ থেকে যতগুলি চিঠি পেয়েছে, তার ভেতর বিনোদিনীর আহ্বান সে অনুভব করেছে, কিন্তু বাড়ি ফিরে সে বিনোদিনীকে কাছে পায় নি, বিনোদিনীর চলনেবলনে দূরত্ব রক্ষার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে বিনোদিনীর কাছে সজল কণ্ঠে সে যা বলেছে, তা প্রেম নিবেদন ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু সে প্রেম কতটা সত্য, তাও প্রশ্ন উঠতে পারে। আত্মশুদ্ধির খাতিরে সে কাশীতে অন্নপূর্ণার কাছে গিয়েছে, আশার প্রতি দায়িত্বশীল হবে, প্রতিজ্ঞা করেছে, কিন্তু ফিরে এসে বিনোদিনীকে দেখে অস্থিরচিত্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশাকে কাশী পাঠাবার মনোবাসনার মূলে ছিল বিনোদিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে লাভের সুযোগ গ্রহণ ; কিন্তু বিহারী আশার সঙ্গে বিনোদিনীকেও কাশীতে পাঠাতে বললে মহেন্দ্র'র ডায়ালগে মনস্তত্ত্বেরই নজির পাওয়া যায়—''বিহারী,··· আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহুদূরে লইয়া যাইতে, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।'' অপ্রত্যাশিত এই উক্তির নির্মমতা বিহারীকে বিশেষভাবে আহত করে।

বিনোদিনী চরিত্রের 'নিয়ন্ত্রী শক্তি প্রেম' হলেও তার অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতিকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। একটি পর্যায়ে, মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর কাছে আত্মনিবেদনে প্রায় নতজানু, বিহারী সেই দৃশ্য দেখে ঘৃণায় ফিরে যাবার মুহূর্তে বিনোদিনী তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে কার্যত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখনই আবার মহেন্দ্র'র প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে—

'বিনোদিনী কহিল, মাপ কিসের জন্য। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার সব আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে?

মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা পায়ে ঠেলিবে না?

বিনোদিনী কহিল, মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, 'চাই না' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।'

বস্তুত, ঘটনাক্রমে, বিনোদিনী বুঝেছে, মহেন্দ্রর প্রবৃত্তির আগুন বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকে সে ভালোবাসতে পারেনি, বিহারীর প্রতিই তার আকর্ষণ অধিকতর হয়েছে। মহেন্দ্রর আত্মসমর্পণ বিনোদিনীকে প্রেমে উন্মত্ত করেনি, বিহারীর প্রত্যাখ্যানে বিনোদিনী তার প্রতি তীব্র ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বিহারী ঘৃণা করুক, প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করুক, বিহারীরও প্রেমদুর্বল অন্তর উন্মোচিত হয়েছে। তার দেওয়া নির্বাসন দণ্ড মেনে নিয়ে বিনোদিনী তাকে আপন করে পাবার সাধনা করেছে—'আমার জীবন শূন্য, আমার হৃদয় শূন্য, আমার চতুর্দিক শূন্য—এই শূন্যতার মাঝখানে তুমি এসো, তোমাকে আসিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।' কিন্তু তার সাধ মেটে নি। 'শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আত্মরক্ষার স্বার্থবুদ্ধি প্রেমের উপলব্ধিতে ভেসে গেছে। দীর্ঘ পথযাত্রার শেষে বিহারীর কাছে বিনোদিনী দ্বিতীয়বার আত্মোদ্‌ঘাটন করেছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে গৃহত্যাগে তার চরিত্রে বিহারীর যে সন্দেহ জেগেছিল সত্যের জোরে সে-সন্দেহ দূর হয়েছে। তারপর বিহারীর শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় প্রেমিকারূপে তার অভিষেক ঘটেছে।' অতঃপর বিহারী বিনোদিনীর বিবাহে বাধা থাকতে পারে না, বিহারীও তাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু বিহারীর মুখে ভালোবাসার কথা শুনে বিনোদিনী বুঝিয়েছে, "এই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটি মাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব। পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই ; প্রাপ্য নাই।··· তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।··· আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।··· তুমি প্রসন্ন হও, সুখী হও।" বিনোদিনীর এই বিনীত প্রত্যাখ্যান তাকে প্রবৃত্তিপীড়িত স্তর থেকে যথার্থ প্রেমিকার স্তরে উন্নীত করেছে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে বিধবাবিবাহ দিতে অগ্রসর হননি, অন্যদিকে বিধবানারীর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত ধারণা, বিনোদিনীর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সমস্যার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। চোখের বালির পরিণাম বিতর্কিত। কিন্তু চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক আবেষ্টন রচনায় বিতর্ক নেই। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্য যা কিছু চিত্তবৈকল্য, চরিত্রের মন ও অবমনের খণ্ড খণ্ড বা জটিল টানাপোড়েন চোখের বালিতে সুস্পষ্ট হয়েছে। তাই চোখের বালি একটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস।

চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস

অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতার প্রবাহকে বোঝাতে উইলিয়াম জেমস 'Stream of Consciousness' শব্দবন্ধটি তাঁর *Principles of Psychology* (1890) গ্রন্থে ব্যবহার করেন। সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে এটি এখন অপরিহার্য ও অমোঘ অভিধা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। স্বীকার করা হয়েছে, 'Now an almost indispensable term in literary criticism, it refers to that technique which seeks to depict the multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind.' (J. A. Cuddon. *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. Third edition)। কথাসাহিত্যে চিন্তার অবিচ্ছিন্ন স্রোতের রূপায়ণই এই পদ্ধতির লক্ষ্য। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'Narrative Method' এম. এইচ. অ্যাব্রাম্‌স ব্যাখ্যা করছেন, 'The Stream of Consciousness, as it was refined after world war I, is a mode of narration that undertakes to capture the full spectrum and flow of a character's mental process, in which sense perceptions mingle with conscious and half conscious thoughts, memories, feelings and random associations." (*A Glossary of Literary Terms*)। 'জাগ্রত মনের নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাপ্রবাহ এবং সচেতনতা'কে বোঝাতেও Stream of Consicousness ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই পদ্ধতির সমূহ বিকাশ ঘটে। "লেখক-এর মাধ্যমে চরিত্রের চেতন ও অর্ধচেতন মনে যে সব স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতি ও নানা আপাতবিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গ ভেসে ওঠে তার সব কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে ঘটনা ও কালের বাস্তব ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য রক্ষিত হয় না, যৌক্তিকতা কিংবা অযৌক্তিকতার বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পায় না, চেতনার অন্তঃশীল প্রভাবে ঠিক যেমনটি ধরা পড়ে তেমনটি প্রতিফলিত হয়।" (কবীর চৌধুরী : সাহিত্যকোষ)।

'চেতনাপ্রবাহ' শব্দগুচ্ছটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হবার অনেক আগেই জর্জ মেরেডিথ এবং হেনরি জেমস তাঁদের উপন্যাসে কোনো কোনো চরিত্রের মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্য দীর্ঘ অন্তর্দর্শনময় (long passages of introspection) বর্ণনায় আস্থাশীল হয়েছিলেন। এমনকি ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে 'মাইনর' ফরাসি লেখক এদুয়ার দুর্জাদ্যাঁ-র *Les Lauriers sont coupes* উপন্যাসে নায়কমনে প্রতিফলিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা লক্ষ্য করা গেছে। এই রীতির পূর্বাভাস রয়েছে অবশ্য অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক লরেন্স স্টার্নের *Tristram Shandy* (1760-1767)-তেও। মানবমনের অতলান্ত রহস্যভেদের প্রবণতা এখানে লক্ষণীয়।

শিল্পসাহিত্য যেহেতু বহুমাত্রিক, সেহেতু চিত্রকলার সূত্র ধরেও বিষয়টি আলোচিত হয়ে থাকে। ১৯১০-এ লন্ডন শহরে ভ্যান গগ, পল গগ্যাঁ, মাতিস, পিকাসো, সেজান প্রমুখের প্রদর্শিত চিত্রকলায় Post impressionism-এর সূত্র ধরেই ১৯২৫-এ ভার্জিনিয়া উলফের মন্তব্য ছিল, 'In or about December 1910 human character changed.' এভাবে একটি বিশেষ বছরে জটিল মানবচরিত্র পাল্টে যেতে পারে কিনা সঙ্গত কারণেই তা আলোচনার বিষয় হতে পারে। আসলে এই সময় থেকে মানবচরিত্র, জীবন ও জগৎকে

দেখা ও শিল্পসাহিত্যে তার প্রতিবেদন-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেনেট, ওয়েলস, গলসওয়ার্দি প্রমুখের রচনায় এই অভিনব প্রক্রিয়ার সামান্য লক্ষণ অনুভূত হয়।

Stream of Consciousness-এর বিকল্প শব্দগুচ্ছ হিসেবে 'Interior monologue' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অন্তর্মুখী আত্মকথনরীতির স্বরূপ বৈশিষ্ট্যর অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা সূত্রে এইচ. এম. অ্যাব্রামস মন্তব্য করেছেন : 'The interior monologue, in its radical form, is sometimes described as the exact reproduction of consciousness ; but since sense, perceptions, feelings and some aspects of thought itself are nonverbal, it is clear that the author must convert these elements into some kind of verbal equivalent, and much of this conversion is a matter of narrative convention rather than of unedited point-for-point reproduction.'

চেতনাপ্রবাহরীতির প্রথম সচেতন শিল্পী হেনরি জেমস তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্লোককে উন্মোচন করেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দেখা গেল অতীত স্মৃতিচারণা-মূলক উপন্যাস রচনার প্রবণতা। ১৯১৩-য় প্রকাশ পেল মার্সেল প্রুস্ত-এর *Remembrance of Things Past* ৬ খণ্ড। ১৯১৫-য় বেরুল ডরোথি রিচার্ডসনের 'পিলগ্রিমেজ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'পয়েন্টেড রুফ্‌স'। এই উপন্যাস আলোচনা সূত্রে সিনক্লেয়ার 'চেতনাপ্রবাহপদ্ধতি' কথাটা প্রথম উল্লেখ করেন। ১৯১৬-য় প্রকাশিত হল জেমস জয়েসের 'এ পোর্ট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ দ্য ইয়ং ম্যান'। ভার্জিনিয়া উলফ ও জেমস জয়েস উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ রীতির মধ্য দিয়ে 'চরিত্রগুলিকে নিজেদের মুখোমুখি' উপস্থাপন করেছেন। "উলফের উপন্যাসের বর্ণনারীতিতে এক শিথিল পুনরাবৃত্তিময় ভঙ্গি আছে। এক ধরনের চিত্রকল্পের প্রতি তাঁর যে ঝোঁক এসেছে, উপন্যাসের ঘটনার বাইরে সে চিত্রকল্পের অন্য কোনো তাৎপর্য নেই। যে অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে একটা বিশেষ প্যাটার্ন বা ছকের মধ্যে একটি চিত্রকল্প বিশেষ তাৎপর্য পাচ্ছে সে তাৎপর্য ওই লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তেমনি আবার জয়েসের রীতিতে চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে সরে সরে যাওয়ার একটা আপাত-আকস্মিকতা সৃষ্টির দক্ষতা আছে যা চেতনাপ্রবাহরীতির মূল উদ্দেশ্যটিকে যেন ধরবার চেষ্টা করছে বলেই মনে হয়।" (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, চেতনাপ্রবাহ : সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য)। ভার্জিনিয়া উলফের 'মিসেস ড্যালওয়ে' উপন্যাসে সময়ের ব্যাপ্তি মাত্র একদিন হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর সংলগ্ন হয়ে আছে অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন, চিন্তাস্রোত। জয়েসের 'ইউলিসিসে'ও একদিনের কাহিনীতে তার 'পূর্বজীবন ও বর্তমান জীবনের সমগ্র বৃহৎ চেতনাটিকে ধরেছে।' জয়েস চেতনাপ্রবাহের একাধিক টেকনিক ইউলিসিসে (১৯২২) প্রয়োগ করেছেন। লিওপোল্ড ব্লুমের মনন ও দর্শন দিয়ে, চোখে দেখা থেকে মনে দেখার ভিতর দিয়ে, চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহের আঙ্গিকে ডাবলিনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় :

Pineapple rock, lemon platt, butter scotch. A Sugarsticky girl shoveling scoopfuls of creams for a christian brother. Some school treat. Bad for their tummies. Lozenge and comfit manufacturer to His Majesty the king. God. Save. our. Sitting on his throne, sucking red Jujubes white.

লিওপোল্ড ব্লুমের এই যে এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন আপাত অসংলগ্ন অভিজ্ঞতা ও অনুভবগুলি এখানে চিত্রিত তা চেতনাপ্রবাহরীতির বা অন্তর্মুখী আত্মকথনরীতি রূপে স্বীকৃত, শিল্পের এই 'ফর্ম' প্রচলিত ছকের বাইরে ; এই প্রসঙ্গে রজার ফাওলার সম্পাদিত গ্রন্থে ব্যাখ্যা হ'ল : 'A technique which seeks to reeord the random and apparently illogical flow of impressions passing through a character's mind.' (*A Dictionary of Modern Critical Terms*)। কিন্তু জয়েস বা ডরোথি রিচার্ডসন বা অন্য লেখকেরা একই রকম প্রক্রিয়া একই রকম পথ অবলম্বন করেননি। "Each writer seeks his own way of organizing , and so communicating, the arbitrary, and each finally gestures towards the inability of any single device to render fully the human condition."

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস-এই অভিধা, অনেকের মতে অচল হয়ে এসেছে। চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাস মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের উন্নততর রূপ। এই অভিমত প্রচলিত, বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং বিশেষভাবে 'রজনী' উপন্যাসে 'চরিত্রের চেতনান্তরকে উন্মোচনের' প্রচেষ্টা রয়েছে। 'রজনী'তে চরিত্রের অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটন বা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে 'আঁতের কথা' প্রকাশের পরীক্ষা লক্ষ্য করা গেল। বুদ্ধদেব বসুর 'লাল মেঘ', 'তিথিডোর', গোপাল হালদারের 'একদা' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', বিমল করের 'অসময়' উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

একটি বাংলা চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আটবছর ধ'রে (১৯৩৫-১৯৪৩) লেখা তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১৯৪৩) ত্রয়ী উপন্যাসের অখণ্ড রূপ চেতনাপ্রবাহরীতির পরীক্ষানিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন রীতির উপন্যাস গদ্যরীতির স্বাতন্ত্র্যে, আখ্যানবস্তুর অভিনবত্বে বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্মরণীয় হয়ে আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ যে চেতনাপ্রবাহরীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা তাঁর রচনায় অস্পষ্ট নয়, তিনিও আমাদের প্ররোচিত করেন এ ভাবনায় প্রাণিত হতে ; 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে খগেনবাবুর বক্তব্যে জানতে পারি, "অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হোল Pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে—চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণী, কোথাও বা আবর্ত, এই তো জীবন!··· প্রধান কথা স্রোত চলছে—কুলুকুলু তার ধ্বনি, কুলকুল করে ভেসে যাচ্ছে কে জানে।" ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মনে হয়েছে, 'এখানেই বইয়ের মূল সূত্র' বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিন্তাজীবী ধূর্জটিপ্রসাদ একথাও খগেনবাবুর মাধ্যমে জানাতে পারেন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'নৈরাত্মরীতি'তে, যে "চিন্তাই চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র বিচারদণ্ড।··· সত্যকার নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীট্‌সের negative capability থাকবে। তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেসে যায়, ঘটনাটা তেমনি বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে।" শুধু চিন্তাস্রোতই নয়, চেতনাস্রোতের ইঙ্গিতও লেখক দিয়েছেন।

'অন্তঃশীলা'য় স্ত্রী সাবিত্রীর বান্ধবী রমলাদেবীর সঙ্গে খগেনবাবুর ঘনিষ্ঠতা আছে সন্দেহে সাবিত্রীর আত্মহত্যা এবং এখানেই এক নতুনতর জীবন-সংকট। সাবিত্রীর তুলনায় রমলাদেবীকে খগেনবাবু কিছুটা উঁচুতেই রাখেন, রমলাদেবীর প্রতিই তাঁর অধিকতর আকর্ষণ। এই খণ্ডে গ্রন্থপ্রিয় সুজন ও উচ্চমধ্যবিত্ত বিজনের উপস্থিতি। মূল্যবোধে দুজনের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান। এখানে তৃতীয় নারীচরিত্র মাসিমা, যিনি কাশীতে থাকেন। বুদ্ধিজীবী চিন্তাপ্রবণ খগেনবাবুর মনে রমলার প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে অস্থিরতা ও তার অন্তর্জীবনের জটিলতায় তাকে কাশী চলে যেতে হয়। কিন্তু কাশীর ধর্মীয় বাতাবরণ ও মনোবিজ্ঞানসম্মত 'বাসনার অবরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায়' খগেনবাবুর চাঞ্চল্য তীব্র হয়, প্রশ্ন জাগে 'সামঞ্জস্য কি কেবল সাহিত্যের ভাষা?' প্রেম জীবনে বিরোধের পরিবর্তে সামঞ্জস্য আনে। এ-উপলব্ধিও তাঁর। পাশাপাশি, এক অমোঘ দোলাচলতায় রমলাদেবী সুজনকে নিয়ে কাশী চলে যান। 'অন্তঃশীলা'য় চিন্তার বিচিত্র স্রোত ও চিন্তাপ্রাধান্য। 'আবর্ত'খণ্ডে সুজন ও খগেনবাবুর মাঝখানে রমলাদেবী। বলা উচিত, রমলা-খগেনবাবুর মাঝখানে সুজন। রমলাদেবীর অনুজপ্রতিম সুজন যখন রমলাকেই দাবি করতে চায়, তখন উপন্যাস মনোবিজ্ঞানের সূত্রে অন্য মাত্রা পায়। যদিও এই খণ্ডেই 'সুজনকে ছেঁটে ফেলে রমলাদেবী খগেনবাবুর কাছে চ'লে আসেন।' ইতিমধ্যে মাসিমার মৃত্যু। এখান থেকেই মোহানার সূত্রপাত। রমলা-সুজন মাসিমা কেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও আবর্তে খগেনবাবুর চিন্তাক্রম উপেক্ষণীয় নয়।

'মোহানা'য় এসে ঔপন্যাসিক টের পেলেন, তাঁর উপন্যাস 'চিত্তবিনোদনমূলক' নয়। এখানে সন্ধান পেলেন, 'গোটা কয়েক চরিত্রের অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি ঠিক জীবনস্রোত নয়।' (নিবেদন : মোহানা)। 'মোহানা'য় যদি দেশকালের সঙ্গে খগেনবাবুর যোগ বেড়ে থাকে তাহলে বিস্ময়ের কারণ নেই। মাসিমার মৃত্যুর পর কাশী ছেড়ে খগেনবাবু ও রমলাদেবী দেশভ্রমণ সূত্রে কানপুরে পৌছান, সেখানে উপন্যাসের ন্যূনতম গল্পবস্তু নতুন দিকে বাঁক নেয় ; 'অন্তঃশীলা'য় স্বরাজপার্টি, 'আবর্ত'য় কংগ্রেসের অভ্যন্তর বিরোধ ও মোহানা'র— বামপন্থী আন্দোলন, অধুনা সাম্যবাদী বিজনের সহযোগে কানপুর শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়া, গ্রন্থপ্রিয় খগেনবাবুর ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়, মানসিক ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল, এখন তার স্ফুরণ। এখানেই ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা সচেতন ধূর্জটিপ্রসাদ মধ্যবিত্ত খগেনবাবুকে মজদুর আন্দোলনে যুক্ত করেন, আর এরই সূত্রে রমলাদেবীর ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া। সফীক, করিম, মহবুবের সঙ্গে খগেনবাবুর পরিচিতি। ধর্মঘটের বিফলতায় সাম্যবাদী বিজনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে না থাকায় খগেনবাবুও যে আটকে পড়েন তা নয়। বরং পার্টির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। সহকর্মীর কমরেডশিপ স্বীকার করেন। এই পর্যায়ে, তাই, মিথ্যা খুনের দায়ে আটক সফীককে ছাড়িয়ে আনতে লখনৌ পর্যন্ত যান, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ছোটেন, জামিনের প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে। এবং 'মোহানা'তেই জানা গেল— 'শয্যায় সাবিত্রী ও রমলা, তবুও সেই দুরতিক্রম্য ব্যবধান দূর হোলো না।··· বিপরীত বোধের জন্ম হোলো, দেহচর্চায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে যেটা বৃদ্ধি পেলো। আজ রমলা সরে গেছে, আন্দোলনে প্রাণ নেই, ধাক্কা খেয়ে যে-কে সেই।' উপন্যাসের পরিসমাপ্তি কিন্তু মহবুব-কিষণের সঙ্গে খগেনবাবুর, ট্যাক্সিতে আরও এক অভিযাত্রায়।

অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা-য়, সমালোচকের অভিমতে, "নায়ক খগেনবাবুর অন্তর্মুখী জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও আত্মজিজ্ঞাসার বিভিন্ন স্তরপরম্পরা মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। জীবনের নানা অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্যক্তিসত্তার মানসপ্রতিক্রিয়া ও তারি মধ্য দিয়ে ব্যক্তির জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের সন্ধানই সমগ্র আখ্যায়িকার লক্ষ্যবস্তু। তিনখানি গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই লেখকের সেই উদ্দেশ্যই ধরা পড়েছে মনে হয়। আত্মানুসন্ধানী নায়কের চিন্তাচেতনার 'অন্তঃশীলা' পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বিপুল জনজীবনের মোহানা'য় গিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে।" (গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য)। অবশ্য আরও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা ভাষায় চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের প্রথম চেষ্টা আসলে বুদ্ধদেব বসু প্রণীত 'লালমেঘ'··· অবশ্য এই ধরনের উপন্যাস সবচেয়ে মগ্নভাবে প্রথম লেখার চেষ্টা করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—তাঁর 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' নামক তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি কোনো কোনো দিক থেকে প্রুস্ত-এরও স্মারক—বিশেষ করে সময় নামক আয়তনের নিপুণ ব্যবহারে—আর চেতনাপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ খণ্ড তিনটির নামেই উদ্ভাসিত।" (মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস : অলোক রায় সম্পাদিত সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য)।